যোগাযোগের প্রকারভেদ
(Type of Communication)

সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনের সর্বস্তরে যোগাযোগ অবিচ্ছেদ্য প্রক্রিয়া হিসাবে কাজ করে থাকে। মানব জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে যোগাযোগের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যোগাযোগ শুধু ব্যক্তিগত জীবনেই নয়, পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে।

একজন ব্যক্তিকে তার নিজের ও প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ যাতে বাস্তবমুখী হয়, সেজন্য প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। মানুষ বিভিন্নভাবে এসব তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। তথ্য সংগ্রহের জন্য মানুষের যোগাযোগ বিভিন্নভাবে সম্পন্ন হয়। বাস্তবতার আলোকে একটি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রকার যোগাযোগ প্রণালী ব্যবহার করে থাকে। তথ্যের উৎসমূল অথবা প্রবাহ বিবেচনায় যোগাযোগ হতে পারে নিম্নমুখী, উর্ধ্বমুখী, আন্তঃব্যক্তিক, সমান্তরাল, উলম্ব, অভ্যন্তরীণ, বাহ্যিক, আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক, একমুখী ও দ্বিমুখী প্রভৃতি।

আন্তঃব্যক্তিক ও অন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ (Interpersonal and Intrapersonal Communication)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- আন্তঃব্যক্তিক ও আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবেন;
- আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের আন্তঃব্যক্তিক ভিত্তিসমূহ সম্পর্কে ধারণা পাবেন;
- আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের সমস্যাবলী চিহ্নিত করতে পারবেন; এবং
- আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের কার্যকারিতা বৃদ্ধির উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের সংজ্ঞা ঃ একটি প্রতিষ্ঠানের একজন ব্যক্তির সাথে অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের যে যোগাযোগ স্থাপিত হয় তাকে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ বলে। প্রতিষ্ঠানে সাংগঠনিক কাঠামো বিভিন্ন পদমর্যাদার অনেক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত হয়। শ্রমিক কর্মি থেকে আরম্ভ করে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা পর্যন্ত এই ব্যক্তি সংগঠনে কর্মরত থেকে ব্যবসায়ের লক্ষ্যার্জনে নিজ নিজ ভূমিকা পালনে করে। সকলে মিলে সম উদ্দেশ্য পানে ধাবিত হয় বলে তাদের মাঝে ক্রিয়াগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় যার কারণেই সংগঠনে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ (Interpersonal Communication) এর সৃষ্টি হয়।

অন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের সংজ্ঞা ঃ যখন কোন যোগাযোগ একজন ব্যক্তির মধ্যে সংঘটিত হয় তখন তাকে অন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ বলে। এক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি নিজেই প্রেরক ও গ্রহীতা হিসাবে কাজ করে। একজন ব্যক্তির সংবেদনশীল অঙ্গ এক্ষেত্রে মস্তিষ্কে তথ্য প্রদান করে এবং মস্তিষ্ক তাকে একটি সুনির্দিষ্ট পন্থায় কাজ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করে। এভাবেই অন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ সম্পন্ন হয়।

আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের অন্তঃব্যক্তিক ভিত্তিসমূহ (Interpersonal foundations for interpersonal communication) ঃ একটি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মিদের মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক যোগাযোগ হলো আন্ড়ঃব্যক্তিক যোগাযোগ। যোগাযোগ সম্পর্কে যোগাযোগকারীর স্বীয় মনের মাঝে বিরাজমান অনুভূতি ও অভিপ্রায়গুলো বা অন্তঃব্যক্তি উপাদানগুলো আন্তঃব্যক্তিক যোগযোগের ভিত্তি প্রদান করে থাকে। মানুষের অনুভূতি ও অভিপ্রায়গুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন-

i) প্রণোদনা (Motivation)
ii) ধারণা অনুভূতি (Perception)
iii) আবেগ (Emotion)

মানুষের মনের এই তিনটি উপদানই হচ্ছে অন্তঃব্যক্তিক চলক যেগুলো আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

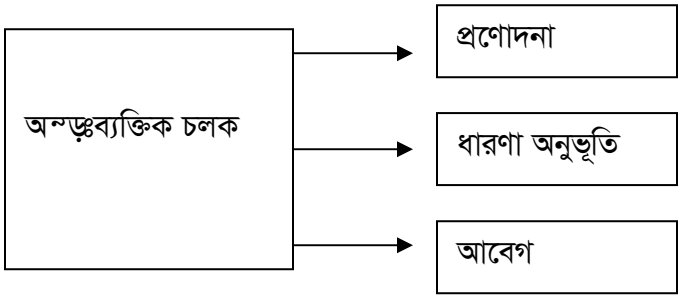

১) **প্রণোদনা (Motivation) ঃ** কর্মিদের মধ্যে উৎসাহ, উদ্দীপনা বা অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হচ্ছে প্রণোদনা বা প্রেষণা, যার মাধ্যমে তাদের কর্মদক্ষতা পূর্ণ সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। আর্থিক ও অনার্থিক উদ্দীপকসমূহ, যেমন- বেতন, বোনাস, চাকুরির নিরাপত্তা, সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি প্রণোদনা সৃষ্টির অন্যতম সহায়ক। প্রণোদনা বা প্রেষণা আন্ড়ঃব্যক্তিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে কর্মির মনের এক গুরুত্বপূর্ণ চলক।

২) **ধারণা (Perception) ঃ** সাধারণত কোন একটি বিষয়ের ফলাফল সম্পর্কে পূর্ব হতে যে চিন্তা করা হয় তাকে ধারণা অনুভূতি বলে। এ ধারণা সঠিক হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। তবে একটি সঠিক ধারণা একটি প্রতিষ্ঠানকে তার লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে। প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকগণ বা পরিচালকগণ ব্যবসায়ের বিভিন্ন কার্যের ফলাফল বা সমস্যা সম্বন্ধে ধারণা করে থাকেন এবং সে সব ধারণার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করেন। তাই প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকদের দক্ষতার উপর ধারণার সঠিকতা অনেকাংশে নির্ভর করে।

৩) **আবেগ (Emotion) ঃ** মানব মনের অভ্যন্তরে নানা কারণে আবেগ সৃষ্টি হয়, যা আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের অন্যতম উপকরণ হিসাবে অভিহিত হয়। উৎকণ্ঠা, চিত্তচাঞ্চল্য বা ব্যাকুলতা মানব মনে আবেগের সৃষ্টি করে। আবেগ আন্তঃব্যক্তিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং সেই সাথে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

এই তিন অন্তঃব্যক্তিক চলক ব্যক্তির অভ্যন্তরে সক্রিয় থাকলে এরা আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। তাই প্রেষণা, ধারণা ও আবেগ সম্বন্ধে সচেতনতাই এ যোগাযোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের সমস্যাবলী (Problem Aruss in Interpersonal) ঃ একটি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মিদের মধ্যে বিরাজমান পারস্পরিক যোগাযোগই হলো আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ। উন্নত ও সুষ্ঠু আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সার্বিক অগ্রগতির জন্য আবশ্যক। কিন্তু এ যোগাযোগকে উন্নত করতে হলে সর্ব প্রথমে ব্যবস্থাপকগণকে এর সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে হবে। তারপর তারা সমস্যাগুলো প্রতিকারের মাধ্যমে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের উন্নয়ন সাধনের জন্য তৎপর হতে পারবেন।

আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে হলে আমাদেরকে সর্বপ্রথম আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ মডেল সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে। উক্ত মডেল বিশ্লেষণ করে আমরা আন্তঃব্যক্তিক ও অন্তঃব্যক্তিক স্তরের কোন এলাকার সমস্যা বা ভাঙ্গন সংঘটিত হচ্ছে তা চিহ্নিত করব।

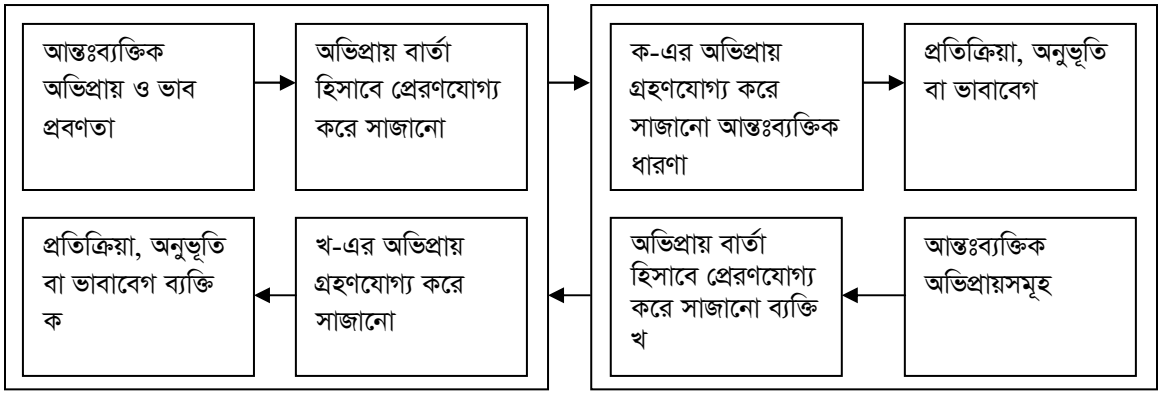

চিত্র ঃ আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের মডেল

উপরোক্ত মডেলটিতে এরূপ একটি অনুসিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে, যে কোন প্রকার আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ একটি আন্তঃব্যক্তিক অভিপ্রায় ব্যক্ত থাকে। এ ধরনের অভিপ্রায় সচরাচর অপ্রকাশ্য থাকে। আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগে কি প্রকারের আন্তঃব্যক্তিক অভিপ্রায় প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে তা অনেকেই সচেতন বা অবচেতন মনে অনুমান করতে পারে বা করে থাকে। এই ধরনের অনুমান আন্তঃব্যক্তিক ধারণা নামে পরিচিত। উদাহরণস্বরূপ একজন কর্মকর্তা যদি মনে করেন যে, তার উর্ধ্বতন তাকে পছন্দ করে না, তা হলে সেও তার উর্ধ্বতনের কোন উপদেশ আমলে আনতে চাইবে না। এরূপ আন্তঃব্যক্তিক ধারণা হতে ভাবপ্রবণতার সৃষ্টি হয়। এ ভাবপ্রবণতা বা প্রতিক্রিয়া আন্তঃব্যক্তিক অভিপ্রায়কে প্রভাবিত করে থাকে।

সুতরাং আমরা দেখতে পাই, কার্যকর যোগাযোগের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য ব্যবস্থাপককে অবশ্যই অন্তঃব্যক্তিক উপাদানগুলোর সাথে সাথে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের কার্যকারণগুলোর প্রতি অত্যন্ত সজাগ থাকতে হবে।

উপরিউক্ত মডেল পর্যালোচনা করে আমরা বলতে পারি, অন্তঃব্যক্তিক উপাদানগুলোর প্রতি উদাসীন থাকলে বা এগুলো উপেক্ষিত হলে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ বিফল হতে পারে ঃ

১) **অভিপ্রায় সম্পর্কে অমনোযোগিতা ঃ** একজন ব্যক্তি তার অভিপ্রায় বা অভিসন্ধি সম্পর্কে অনবহিত থাকতে পারেন। এরূপ অবস্থায় দু'ব্যক্তির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হবে না।

২) **অভিপ্রায় প্রেরণযোগ্য করে সাজাবার কালে সমস্যা ঃ** মানব মনের অভিপ্রায় প্রেরণযোগ্য করে সাজানোর সময় যোগাযোগের বিফলতা সৃষ্টি হতে পারে। অন্তঃব্যক্তিক পর্যায়েও এনকোডিং সংক্রান্ত সমস্যার সৃষ্টি হয়। ভয়-ভীতি এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব ইত্যাদির জন্য কোন ব্যক্তিকে তার সত্যিকার চাওয়া-পাওয়া প্রকাশ করতে নিরুৎসাহিত করে।

৩) **পূর্ব ধারণার অবাস্তবতা ঃ** আন্তঃব্যক্তিক ধারণা থেকেও যোগাযোগের বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে। প্রাপ্ত সংবাদ গ্রহণযোগ্য করে সাজাবার সময় আন্তঃব্যক্তিক ধারণা খুব বেশি পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। সাধারণত দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তি সম্পর্কে পূর্ব ধারণা অনুযায়ী আমরা তার নিকট হতে সংবাদ গ্রহণ করি। এরূপ পরিস্থিতিতেও যোগাযোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যহত হতে পারে।

৪) **আবেগের অস্বীকৃতিজনিত সমস্যা ঃ** কোন ব্যক্তির আবেগকে যথাযথ উপায়ে মর্যাদা বা স্বীকৃতি দেয়া না হলেও আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ বিঘ্নিত হতে পারে। যে সকল ব্যক্তির মধ্যে যোগাযোগ সংঘটিত হয় তারা নিজেদের অনুভূতি বা ভাবাবেগ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না থাকলে এবং যথাযথ স্বীকৃতি না দিলে যোগাযোগের আসল উদ্দেশ্য বিফল হবে।

আন্ড়ঃব্যক্তিক যোগাযোগের কার্যকারিতা বৃদ্ধির উপায় ঃ পূর্বের আলোচনায় আমরা আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে উদ্ভুত সমস্যাবলী চিহ্নিত করেছি। এখানে আমরা এর কার্যকারিতা বৃদ্ধির কতিপয় পথনির্দেশ সম্পর্কে আলোচনা করব ঃ

ক) আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি ঃ একজন ব্যক্তি নিজের অভিপ্রায় সম্পর্কে নিজেই যদি সচেতন না থাকে তাহলে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের অন্তরায় সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাই প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আত্মসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

খ) অনুভূতি সম্পর্কিত সচেতনতা ঃ একজন ব্যক্তি স্বীয় অনুভূতির প্রতি মনোযোগী না হলে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ বিঘ্নিত হবে। এ কারণে সে নিজের অনুভূতি সম্পর্কে বিশেষ মনোযোগী হবে এবং কোন ঘটনা সম্পর্কে নিজস্ব অনুভূতির আলোকে অন্য ব্যক্তির নিকট তার আচরণ প্রকাশ করবে।

গ) **অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঃ** একজন ব্যক্তির অনুভূতি, মনোভাব ও অভিপ্রায় প্রকাশ করা হলে তাকে উক্ত ব্যক্তির স্বপ্রকাশ (Self disclosure) বলা যায়। স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ, আত্মসচেতনতা ও অন্য ব্যক্তি কর্তৃক সঠিকভাবে বিবেচিত হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে আন্ড়ঃব্যক্তিক যোগ্যতার উন্নয়ন সাধন করে থাকে। ব্যক্তির অভিপ্রায় ও মনোভাবের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের জন্য তাকে ভয়-ভীতি থেকে মুক্ত হতে হবে। তাই আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের মান উন্নত করার জন্য ভয়-ভীতি পরিহার করে নিজের অনুভূতিকে প্রকাশ করতে হবে।

ঘ) **আন্তঃব্যক্তিক অভিপ্রায়ের স্ব-প্রকাশ ঃ** ব্যক্তি বিশেষের আন্তঃব্যক্তিক অভিপ্রায়সমূহ প্রকাশের মাধ্যমে আত্মসচেতনতা ও আন্তঃব্যক্তিক ধারণা বৃদ্ধি করা যায়। একজন ব্যক্তির নিজের অভিপ্রায় অন্যের নিকট পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করা দরকার। অন্যথায় অন্যরা তার অভিপ্রায় সম্পর্কে অন্ধকারে থেকে যাবে। তাই আন্ড়ঃব্যক্তিক যোগাযোগের উন্নয়নের জন্য নিজস্ব অভিপ্রায় অন্যের নিকট প্রকাশ করতে হবে।

ঙ) **আন্ড়ঃব্যক্তিক যোগাযোগের সঠিকতা বৃদ্ধি ঃ** আন্তঃব্যক্তিক ধারণার সঠিকতা বৃদ্ধির একটি অন্যতম উপায় হলো অনুভূতি এবং আন্তঃব্যক্তিক অভিপ্রায়ের স্ব-প্রকাশ নিশ্চিত করা। একজন ব্যক্তি যদি অন্য একজনের অনুভূতি ও চাহিদা জানতে পারে, তবে তার দ্বারা দ্বিতীয় ব্যক্তির কার্যাবলীকে ভুল ব্যাখ্যা করার সম্ভাবনা কম থাকে। আন্তঃব্যক্তিক ধারণার সঠিকতা বৃদ্ধির আরেকটি উপায় হলো অন্যের কাজ ব্যাখ্যা করার সময় নিজে পর্যবেক্ষণ করা। নিজের পর্যবেক্ষণ জনিত সিদ্ধান্ত সমূহ কতটুকু সঠিক তাও বিবেচনা করতে হবে। সচরাচর ভুল অনুমিতির দারুণ আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ বিঘ্নিত হয়। সুতরাং অনুমিতিসমূহ বিচার-বিশ্লেষণ করার পর নিজের অনুভূতি ও অভিপ্রায় প্রকাশ করার মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যাহত হবার সম্ভাবনা বহুলাংশে হ্রাস পায়।

পাঠ সংক্ষেপ

- একজন ব্যক্তির সাথে অন্য একজন ব্যক্তির মধ্যে যে যোগাযোগ হয় তাকে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ বলে।
- একজন ব্যক্তির নিজের মধ্যে যে যোগাযোগ হয় তাকে অন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ বলে।
- আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের ভিত্তিসমূহ হলো প্রণোদনা, ধারণা ও আবেগ।
- আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের সমস্যা গুলো হলো অভিপ্রায় সম্পর্কে অমনোযোগিতা, অভিপ্রায় প্রেরণযোগ্য করে সাজাবারকালে সমস্যা, পূর্ব ধারণার অবাস্তবতা, আবেগের অস্বীকৃতিজনিত সমস্যা।
- আন্ড়ঃব্যক্তিক যোগাযোগের কার্যকারিতা বৃদ্ধির উপায়গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো; আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি, অনুভূতি সম্পর্কে সচেতনতা, অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ, আন্তঃব্যক্তিক অভিপ্রায়ের স্বপ্রকাশ, আন্তঃব্যক্তিক ধারণার সঠিকতা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন-

১) একজন ব্যক্তির মধ্যে যে যোগাযোগ সংঘটিত হয় তাকে বলে-

ক) আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ
খ) অন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ
গ) স্ব-যোগাযোগ
ঘ) একমুখী যোগাযোগ

২) আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের অন্তঃব্যক্তিক ভিত্তি হলো-

ক) ১ টি
খ) ২টি
গ) ৩টি
ঘ) ৪টি

৩) আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের অন্তঃব্যক্তিক ভিত্তি কোনটি?

ক) মনোবল
খ) ধারণা
গ) নেতৃত্ব
ঘ) কোনটি নয়।

৪) আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম সমস্যা-

ক) অভিপ্রায় সম্পর্কে অমনোযোগিতা
খ) আবেগের স্বীকৃতিজনিত সমস্যা
গ) পূর্ব ধারণার বাস্তবতা
ঘ) কোনটিই নয়।

৫) আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের কার্যকারিতা বৃদ্ধির অন্যতম উপায় হলো-

ক) আত্মসচেতনা বৃদ্ধি
খ) অনুভূতি সম্পর্কে আত্মসচেতনা
গ) অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত অপ্রকাশ
ঘ) কোনটিই নয়।

গণ-যোগাযোগ (Mass Communication)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- গণ-যোগাযোগের সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবেন;
- গণ-যোগাযোগের প্রকৃতি, প্রক্রিয়া ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- গণ-যোগাযোগের মাধ্যম বর্ণনা করতে পারবেন; এবং
- গণ-যোগাযোগের আওতা ও গুরুত্ব নিরূপণ করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

গণ-যোগাযোগের সংজ্ঞা ঃ সাধারণ ভাবে যোগাযোগ বলতে আমরা পরস্পরের ভাব বা তথ্যের আদান-প্রদানকে বুঝে থাকি। এটা গণ-যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। গণ-যোগাযোগ সাধারণ যোগাযোগেরই একটি অংশ। যখন প্রেরক বা সংবাদদাতা বা যোগাযোগকারী কোন তথ্য, সংবাদ, ধ্যান-ধারণা বা সিদ্ধান্ত একই সময়ে অধিক সংখ্যক শ্রবণকারী জনসাধারণের নিকট পরিবেশন বা জ্ঞাপন করে তাকে গণ-যোগাযোগ বলে। এক্ষেত্রে সংবাদ গ্রাহকের সংখ্যা সুনির্দিষ্ট থাকে না। সাধারণ জনগণ বা বিভিন্ন ধরনের সাধারণ শ্রোতাবর্গের উদ্দেশ্যে সংবাদ বা তথ্য পরিবেশন করা হয়। অধ্যাপক ম্যাকফারফ্যান্ড বলেন, "এটা দ্বারা জনগণের মধ্যে অর্থসমূহের অনুভূতি সঞ্চার করা এবং ভাব বা চিন্তা ধারা পৌঁছানোর প্রক্রিয়া বিশেষকে বুঝায়"।

গণ-যোগাযোগের প্রকৃতি ঃ গণ-যোগাযোগের প্রকৃতি সাধারণত দু'টি। একটি ব্যক্তিক বা প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপরটি সার্বজনীন। যখন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সীমিতভাবে তার কাজকর্ম, সিদ্ধান্ত, ভাব বা অভিমত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক কর্মিদের জ্ঞাপন করায়, তখন তা ব্যক্তিরূপ লাভ করে। আবার যখন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিজস্ব গন্ডির বাইরের লোকজন, সমাজ তথা রাষ্ট্র বিশ্ব সমাজের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে তখন তা সার্বজনীন রূপ ধারণ করে। তদুপরি, রাষ্ট্রীয় তথা বিশ্ব সমাজের যোগাযোগের প্রকৃতিও সার্বজনীন গণ-যোগাযোগ।

অনেকে গণ-যোগাযোগের উপরোক্ত দু'টি রূপকে ব্যষ্টিক বা সমষ্টিক গণ যোগাযোগ বলেও আখ্যায়িত করেন। এছাড়া বর্তমান বিশ্বে গণ-যোগাযোগের আরও দু'টি রাজনৈতিক রূপও রয়েছে। যথা-সমাজ তান্ত্রিক (Socialistic) গণ-যোগাযোগ এবং ধনতান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক বা মুক্ত বিশ্বের গণ-যোগাযোগ। এদের একটি নিয়ন্ত্রিত অর্থে এবং অপরটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়।

গণ-যোগাযোগের প্রক্রিয়া ঃ গবেষকবৃন্দ গণ-যোগাযোগের চারটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন- ক) যোগাযোগকারী, খ) সংবাদ, গ) চ্যানেল এবং ঘ) শ্রোতা।

গবেষকদের ভাষায়, যোগাযোগকারীদের বলা হয় এনকোডার, সংবাদকে বলা হয় সিম্বল, চ্যানেলকে বলা হয় গণমাধ্যম এবং শ্রোতাকে জিকাগর বলা হয়। অন্যান্য যোগাযোগের ন্যায় গণ-যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় কোন "গোলমাল" বা বিঘ্ন ঘটতে পারে এটাকে চ্যানেল বিঘ্ন বলা হয়।

গণ-যোগাযোগের উদ্দেশ্য ঃ একজন গণ-যোগাযোগকারী প্রধানত নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গণ-যোগাযোগের আশ্রয় নিয়ে থাকেন -

১) আপন মতামত জনসাধারণে প্রচারের মাধ্যমে অন্যদের মতামতকে প্রভাবিত করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করা;
২) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জনমত গড়ে তোলা;
৩) উৎপাদনের গতি অব্যাহত রেখে এবং বণ্টন কার্য সম্প্রসারিত করে অর্থনীতিকে স্বচ্ছল রাখার উদ্দেশ্যে পণ্য ও সেবার বিজ্ঞাপন প্রচার করা;
৪) জনসাধারণকে দেশ-বিদেশের হালচাল সম্পর্কে অবহিত রাখা;
৫) জনগণের মধ্যে আনন্দ সঞ্চার করে সুস্থ সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা;
৬) শিক্ষামূলক কার্যের পরিধি সম্প্রসারিত করা;
৭) একই দেশের বিভিন্ন গোত্র বা সমাজের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে বৃহত্তর সামাজিক সংযোগ গড়ে তোলা;
৮) আন্তর্জাতিক বাজারে অনুপ্রবেশ করা;
৯) আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে আন্তর্জাতিক কুটনীতিতে বিশিষ্ট স্থান দখল করা;
১০) প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে এমন কোন সমস্যার উদ্ভব হলে যা সমস্ত কর্মিকে প্রভাবিত করে, তার সমাধানের পথ বের করা;
১১) সরকারী নীতি, কার্যসূচি দেশবাসীর সমক্ষে তুলে ধরা এবং
১২) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জাতীয় দুর্দিনে সমগ্র দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করে তোলা।

গণ-যোগাযোগের আওতা ও গুরুত্ব ঃ বিশ্ব সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে গণ-যোগাযোগের পরিধিও দিন দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে। আদিম যুগে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগেরই প্রাধান্য ছিল। কিন্তু কালক্রমে সভ্যতার বিবর্তনে গণ-যোগাযোগের আওতা কল্পনাতীতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নের আলোচনা থেকে গণ-যোগাযোগের আওতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা সৃষ্টি হবে। একই সাথে এর গুরুত্ব নিরূপণও সহজতর হবে।

১) **সামাজিক ক্ষেত্র ঃ** সমাজের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই আজ গণ-যোগাযোগের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। গণ-যোগাযোগ দূরকে করেছে নিকট, আর নিকটকে করেছে নিকটতর। তার ফলে সমগ্র বিশ্ব আজ মানব সমাজে পরিণত হয়েছে।

২) **রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঃ** আজকের গণতন্ত্রের যুগে গণ-যোগাযোগ রাজনীতির অন্যতম হাতিয়ার। গণ-যোগাযোগের মাধ্যমেই রাজনীতিবিদগণ জনগণের মতামত গঠন করেন, নির্বাচনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং সভা-সমিতির মাধ্যমে ভোটারকে প্রভাবিত করেন।

৩) **আন্তর্জাতিকতা ঃ** গণ-যোগাযোগের ফলে বিশ্ব নেতৃত্ব প্রভাবিত হয়। আন্তর্জাতিক গণ-যোগাযোগ বিশ্ব রাজনীতিকে সচলতর করে রেখেছে। এর মাধ্যমে দেশী ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

৪) **রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনা ঃ** রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনা ও নীতি নির্ধারণ গণ যোগাযোগের আওতাভূক্ত। এর ফলে এখন অনেক দেশে আলাদা "যোগাযোগ মন্ত্রণালয়" দেখা যায়।

৫) **ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ** আধুনিক ব্যবসা বাণিজ্য গণ-যোগাযোগেরই ফসল। এর মাধ্যমে বাণিজ্যের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। ব্যবসায়ীরা স্বল্প ব্যয়ে ও সময়ে তাদের পণ্যের প্রচার করতে পারে, ভোক্তাদের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলে, বিভিন্ন উৎস থেকে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে কাঁচামাল সংগ্রহ এবং বিশ্ব বাজারে প্রবেশের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

৬) **কারবার ব্যবস্থাপনা ঃ** কারবার ব্যবস্থাপনাও বিভিন্নভাবে গণ-যোগাযোগের আওতাভুক্ত। ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের সফল পরিচালনার জন্য বিভিন্ন উপায়ে গণ-যোগাযোগের সাহায্য গ্রহণ করে।

৭) **বিপণন ক্ষেত্র ঃ** আধুনিক বাণিজ্য জগতে গণ-যোগাযোগ ব্যতীত পণ্য বা সেবার বিপণনের কথা কল্পণাই করা যায় না। এর মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বা বিদেশেও পণ্য বা সেবা বিতরণ করা সম্ভব।

৮) **শিক্ষাক্ষেত্র ঃ** রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট এর মাধ্যমে গণ-যোগাযোগ শিক্ষা ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

গণ-যোগাযোগের মাধ্যম ঃ গণ-যোগাযোগের প্রাচীনতম মাধ্যম হলো মুদ্রিত শব্দ এবং ছবি যা দৃষ্টির মাধ্যমে তথ্য অনুধাবনে সহায়তা করে। বর্তমানে বহু প্রকারের গণ-যোগাযোগের মাধ্যম দেখা যায়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মাধ্যমগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ

১) **মুদ্রিত বস্তু ঃ** মুদ্রিত মাধ্যমের মধ্যে সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক ইত্যাদি সাময়িকী, দৈনিক সংবাদপত্র, বই, পাম্পলেট, ইস্তাহার, প্রত্যক্ষ ডাক-প্রচার পত্র ও বিলবোর্ড প্রভৃতি অন্যতম।

২) **শ্রবণ মাধ্যম ঃ** রেডিও, রেকর্ড প্লেয়ার ইত্যাদি এ শ্রেণীর মাধ্যম। এগুলো হতে শুধু তথ্য শুনতে পারা যায় বলে এরা শ্রবণ মাধ্যম বলে পরিচিত।

৩) **শ্রবণ দর্শন মাধ্যম ঃ** টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও ভিসিআর-এ কোন বক্তব্য বা বিষয় একই সাথে শোনা ও দেখা যায় বলে একে শ্রবণ-দর্শন মাধ্যম বলা হয়। এ মাধ্যমগুলো অধিক সংখ্যক লোকের সাথে যোগাযোগের একটি কার্যকর মাধ্যম।

৪) **গতানুগতিক মাধ্যম ঃ** লোক-নৃত্য, যাত্রা, থিয়েটার, কবির আসর, পালা গানের আসর, নাটক প্রভৃতি গতানুগতিক গণ-যোগাযোগের মাধ্যম।

৫) **মৌখিক গণ-যোগাযোগ মাধ্যম ঃ** জনসভা, দলীয় আলোচনা, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, টেলিফোন ইত্যাদি।

৬) **মুদ্রিত ও দর্শনীয় অন্যান্য মাধ্যম ঃ** পোস্টার, সিনেমা, স্লাইড বোর্ডিং, নিয়ন সাইন ইত্যাদি।

পাঠ সংক্ষেপ

- গণ-যোগাযোগ দ্বারা জনগণের মধ্যে অর্থসমূহের অনুভূতি সঞ্চার করা এবং ভাব বা চিন্তাধারা পৌঁছানোর প্রক্রিয়া বিশেষকে বুঝায়।
- গণ-যোগাযোগের প্রকৃতি সাধারণত দু'টি: একটি ব্যক্তিক বা প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপরটি সার্বজনীন।
- গণযোগাযোগের প্রক্রিয়া চারটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। যথা: যোগাযোগকারী, সংবাদ, চ্যানেল ও শ্রোতা।
- গণ-যোগাযোগের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো আপন মতামত জনসাধারণে প্রচারের মাধ্যমে অন্যদের মতামতকে প্রভাবিত করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করা।
- সামাজিক ক্ষেত্রে, সমাজের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই আজ গণ-যোগাযোগের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।
- রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আজকের গণতন্ত্রের যুগে গণ-যোগাযোগ রাজনীতির অন্যতম হাতিয়ার।
- আন্তর্জাতিকতায় গণ-যোগাযোগের ফলে বিশ্ব নেতৃত্ব প্রভাবিত হয়।
- রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনা ও নীতি নির্ধারণ গণ-যোগাযোগের আওতাভুক্ত।
- ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা স্বল্প ব্যয়ে ও সময়ে তাদের পণ্যের প্রচার করতে পারে, ভোক্তাদের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলে, বিভিন্ন উৎস থেকে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে কাঁচামাল সংগ্রহ এবং বিশ্ব বাজারে প্রবেশের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।
- গণ-যোগাযোগের মাধ্যমসমূহ হলো: মুদ্রিত বস্তু, শ্রবণ মাধ্যম, শ্রবণ-দর্শন মাধ্যম, গতানুগতিক মাধ্যম, মৌখিক গণ-যোগাযোগ মাধ্যম, মুদ্রিত ও দর্শনীয় অন্যান্য মাধ্যম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন-

১) কোনটি গণ-যোগযোগের মাধ্যম?

ক) মুদ্রিত বস্তু খ) অশ্রবণ মাধ্যম

গ) মৌখিক যোগাযোগ মাধ্যম ঘ) কোনটিই নয়।

২) গণ-যোগাযোগের প্রকৃতি সাধারণত

ক) ১টি খ) ২টি

গ) ৩টি ঘ) ৪টি

৩) গবেষকবৃন্দ গণ-যোগাযোগের কয়টি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন?

ক) ৪টি খ) ২টি

গ) ৩টি ঘ) কোনটিই নয়।

৪) কোন ক্ষেত্রে গণ-যোগাযোগের প্রয়োজন নেই?

ক) সামাজিক ক্ষেত্র খ) রাজনৈতিক ক্ষেত্র

গ) ব্যবসা-বাণিজ্য ঘ) ব্যক্তিগত ক্ষেত্র।

নিম্নগামী ও উর্ধ্বগামী যোগাযোগ
(Downward and Upward Communication)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- নিম্নগামী ও উর্ধ্বগামী যোগাযোগের সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবেন;
- নিম্নগামী যোগাযোগের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- নিম্নগামী যোগাযোগের সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা করতে পারবেন;
- উর্ধ্বগামী যোগাযোগের সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা করতে পারবেন; এবং
- নিম্নগামী ও উর্ধ্বগামী যোগাযোগের পার্থক্য করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

নিম্নগামী যোগাযোগের সংজ্ঞা ঃ সাধারণ অর্থে, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তার অধীনস্থ কর্মচারিদের সাথে যে যোগাযোগ করে, তাকে নিম্নগামী যোগাযোগ বলা হয়। এরূপ যোগাযোগে তথ্যাদি প্রতিষ্ঠানের উচ্চস্তর হতে হতে আরম্ভ করে বিভিন্ন মধ্যবর্তী পর্যায়ে ঘুরে প্রতিষ্ঠানের নিম্নতম ধাপে পৌঁছায়। যেমন একটি প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার একিট নির্দেশ শ্রমিকদের সুপারভাইজারের নিকট পৌঁছাতে চান। প্রথমে তিনি তা সংশ্লিষ্ট ডেপুটি ম্যানেজারের নিকট প্রেরণ করেন এবং ডেপুটি ম্যানেজার এই নির্দেশ যথারীতি সহকারী ম্যানেজারের নিকট পাঠিয়ে দেন। পরবর্তীতে তা সুপার ভাইজারের নিকট পৌছে। এভাবে একটি তথ্য যখন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার নিকট হতে নিম্ন পদস্থ কর্মচারির নিকট পৌছে, তখন তাকে নিম্নগামী যোগাযোগ বলে।

নিম্নগামী যোগাযোগ

উর্ধ্বগামী যোগাযোগের সংজ্ঞা ঃ সাধারণ অর্থে, উর্ধ্বমুখী যোগাযোগের তথ্য প্রবাহ নিচ থেকে উপরের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। প্রতিষ্ঠানের কর্মচারিরা যখন তাদের বসের সাথে সংবাদ বিনিময় করে বা নিম্নপদস্থ ব্যক্তি

যখন উচ্চপদস্থ যে কোন ব্যক্তির সাথে তথ্য বিনিময় করে তখন সেই সংবাদ বা তথ্য উর্ধ্বমুখী যোগাযোগ নামে বিবেচিত হয়। উর্ধ্বগামী যোগাযোগ মূলত নিম্নগামী যোগাযোগের বিপরীত গতি প্রবাহ যেমন-একজন শ্রমিক তার বেতন বৃদ্ধির জন্য আবেদন করতে চাইলে সে প্রথমে তার সুপারভাইজারের সাথে আলাপ করতে পারে। পরবর্তীতে এ আবেদন সহকারী ম্যানেজার, ডেপুটি ম্যানেজার, ম্যানেজার হাত ঘুরে জেনারেল ম্যানেজারের হাতে পৌঁছে। সুতরাং উর্ধ্বমুখী যোগাযোগের সূত্রপাত হয় নিম্নস্তরে এবং পরিসমাপ্তি ঘটে উচ্চ স্তরে।

উর্ধ্বগামী যোগাযোগ

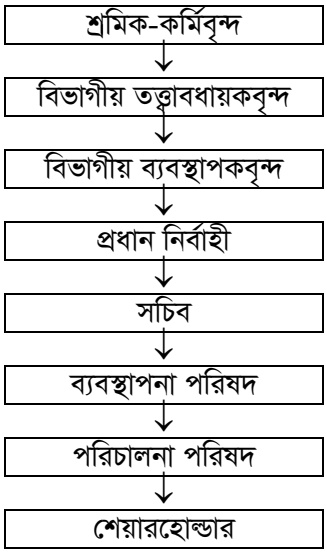

নিগমী যোগাযোগের উদ্দেশ্য ঃ নিগামী যোগাযোগের কতিপয় মৌলিক উদ্দেশ্য আছে। নিম্নে তা আলোচনা করার চেষ্টা করা হলো-

১) **নির্দেশ প্রদান ঃ** ব্যবস্থাপনার সকল সিদ্ধান্ত সকল স্তরে পৌঁছানোর জন্য নিম্নগামী যোগাযোগ করা হয়। কার্য সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট নির্দেশাবলী প্রদান করা হয়, যাতে কর্মিরা নির্দিষ্ট নিয়ম মোতাবেক দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারে।

২) **তথ্য সরবরাহ ঃ** নিগামী যোগাযোগের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো কর্মিদের তথ্য সরবরাহ করা যাতে তারা তাদের স্বীয় দায়িত্ব ও প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কাজের সাথে নিজ কাজ ও দায়িত্বের সম্পর্ক সুষ্ঠুভাবে অনুধাবন করতে পারে।

৩) **অবহিতকরণ ঃ** প্রতিষ্ঠানের উচ্চস্তরে গৃহীত নীতিসমূহ, কর্মসূচী, পরিকল্পনা, সিদ্ধান্তসমূহ ইত্যাদি সম্পর্কে অধস্তনদেরকে অবহিত করানোর জন্য নিম্নগামী যোগাযোগ প্রয়োজন।

৪) **দায়িত্ব ও কর্তব্য বণ্টন ঃ** প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মিদের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্য বণ্টন করার প্রয়োজন। নিগামী যোগাযোগ তা নিশ্চিত করে।

৫) **কাজের মূল্যায়ন ঃ** অধস্তন দ্বারা সম্পাদিত কাজের যথাযথ মূল্যায়ন করে তাকে অবহিত করার জন্য এ যোগাযোগের প্রয়োজন হয়। ফলে কর্মিরা তাদের কাজের সাফল্য বা ত্রুটি সম্পর্কে জানতে পারে।

৬) **কাজের সমন্বয়সাধন ও নিয়ন্ত্রণ ঃ** পরিকল্পনা অনুযায়ী যাতে কার্য সম্পাদন হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নগামী যোগাযোগ অপরিহার্য।

৭) **অনুপ্রেরণা সৃষ্টি ঃ** প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হাসিল করার জন্য উৎসাহ সৃষ্টির বিভিন্ন প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি এবং অনুপ্রাণিত করার হাতিয়ার হলো নিগামী যোগাযোগ।

নিম্নগামী যোগাযোগের সুবিধাসমূহ ঃ নিম্নগামী যোগাযোগে প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন ব্যক্তি তার নিয়ন্ত্রাধীনে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারির নিকট আদেশ-নির্দেশ পাঠিয়ে থাকে। নিম্নে নিম্নগামী যোগাযোগের বিভিন্ন সুবিধাসমূহ আলোচনা করা হলো ঃ-

১) **কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি ঃ** নিম্নগামী যোগাযোগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মিরা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিকট হতে কার্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আদেশ, নির্দেশ, ব্যাখ্যা, বিবৃতি প্রভৃতি পেয়ে থাকে। ফলশ্রুতিতে অধস্তনদের কাজ সম্পাদন করা সহজ হয়। এতে অধস্তনদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

২) **নীতি ও পলিসি অবহিত করা ঃ** এর মাধ্যমে সহজে প্রতিষ্ঠানের উপরের স্তরে গৃহীত পলিসি ও নীতিসমূহ অধস্ড়নদের অবহিত করা যায়।

৩) **শৃঙ্খলা বজায় রাখা ঃ** নিম্নগামী যোগাযোগে যেহেতু অফিসিয়াল রীতি নীতি মেনে চলা হয় বলে অফিসের শৃঙ্খলা বজায় থাকে।

৪) **লক্ষ্যার্জন সহজ ঃ** লক্ষ্যার্জনের জন্য বাস্তব ক্ষেত্রে কিভাবে কাজ করতে হবে, তা উর্ধ্বতনরা অধস্তনদের নির্দেশ প্রদান করে। ফলে লক্ষ্যার্জন সহজ হয়।

৫) **কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা হস্তান্তর ঃ** নিম্নগামী যোগাযোগের আরও একটি সুবিধা হলো অধস্তনদের মাঝে সহজে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায়।

৬) **ব্যাখ্যা প্রদান ঃ** এ যোগাযোগে অনেক সময় নীতি বা পলিসির ব্যাখা প্রদান করা সম্ভব হয়। ফলশ্রুতিতে তারা সার্বিকভাবে কাজ সম্পাদন করতে পারে।

৭) **সম্পর্কের উন্নয়ন ঃ** নিম্নগামী যোগাযোগের মাধ্যমে উর্ধ্বতনদের নিকট হতে তথ্যাদি আন্তরিকতার সাথে অধস্তনদের মধ্যে বিনিময় ঘটলে উভয় পক্ষের সুসম্পর্ক গড়ে উঠে।

৮) **সংগঠন কাঠামোর উন্নয়ন ঃ** এ ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোর উন্নয়ন ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়।

নিম্নগামী যোগাযোগের অসুবিধা ঃ সুবিধার পাশাপাশি নিম্নগামী যোগাযোগের বেশ কিছু অসুবিধা রয়েছে। নিম্নে নিম্নগামী যোগাযোগের কতিপয় অসুবিধা আলোচনা করা হলো-

১) **কর্মদক্ষতা হ্রাস ঃ** নিম্নগামী যোগাযোগের বিভিন্ন নির্দেশ প্রদানের ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে কর্মিদের কর্মদক্ষতা হ্রাস পায়।

২) **ব্যাখার অভাব ঃ** নিম্নগামী যোগাযোগে প্রায়ই উর্ধ্বতন ব্যক্তিরা আদেশ-নির্দেশের যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করেনা। ফলে অর্ধস্তনরা তথ্যের সঠিক অর্থ বুঝতে ব্যর্থ হয়।

৩) **কাজের ধারা ও শৃঙ্খলা ব্যহত হয় ঃ** এ ধরনের যোগাযোগ নির্দেশনামূলক, ফলে অনেক সময় অধস্তন কর্মিরা তাদের আদেশ-নির্দেশকে সন্দেহের চোখে দেখে, ফলশ্রুতিতে কাজের ধারা ও শৃঙ্খলা ব্যহত হয়।

৪) **ফলাবর্তনের অভাব ঃ** নিম্নগামী যোগাযোগ এক তরফা হয়ে থাকে। এর সাথে যদি স্বতঃস্ফূর্ত ফলাবর্তনকে উৎসাহিত করা না যায়, তা হলে এ যোগাযোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে পারে।

৫) **মনোবল হারিয়ে ফেলা ঃ** অনেক সময় তথ্য বা নির্দেশ প্রদান বিলম্ব হলে কর্মিরা কাজে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। ফলে তাদের মধ্যে কর্মস্পৃহা কমে যায়।

৬) **সম্পর্কের অবনতি ঃ** উর্ধ্বতনদের যোগাযোগে অদক্ষতা থাকলে কর্মিদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় দুই পক্ষের মধ্যে শ্রদ্ধাবোধ হ্রাস পায়। ফলে প্রায়ই ব্যবস্থাপনা ও কর্মিদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি লক্ষ্য করা যায়।

উর্ধ্বগামী যোগাযোগের সুবিধা ঃ উর্ধ্বগামী যোগাযোগ ব্যবস্থা হলো নিম্নগামী যোগাযোগেরই বিপরীত গতি প্রবাহ। উর্ধ্বগামী যোগাযোগ কাঠামোতে প্রেরক প্রাপকের নিচে অবস্থান করে। নিম্নে উর্ধ্বগামী যোগাযোগের কতিপয় সুবিধা আলোচনা করা হলো-

১) **সংগ্রহ ঃ** উর্ধ্বমুখী যোগাযোগের প্রধান সুবিধা হলো প্রতিষ্ঠানের নিম্নপদস্থ ও শ্রমিক কর্মিদের নিকট হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা। ফলে প্রতিষ্ঠানের যেকোন সমস্যার সমাধান সহজ হয়।

২) **নিম্নগামী যোগাযোগের ফলাবর্তন ঃ** ব্যবস্থাপনায় যেসব কর্মকর্তাগণ জড়িত থাকেন। তারা অধীনস্ত কর্মচারিদের নিকট কে তথ্য পাঠিয়েছে, তা ঠিকমত পৌছেছে কি না এবং তথ্য প্রাপক ঠিকমত বুঝতে পেরেছে কিনা বা প্রাপক তা গ্রহন করেছে কিনা এ সম্পর্কে কর্মকর্তাগণ উর্ধ্বগামী যোগাযোগ থেকে জানতে পারে।

৩) **সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ** উর্ধ্বগামী যোগাযোগের মাধ্যমে নিম্ন পদস্থ কর্মিদের অভাব অভিযোগ, প্রস্তাব, মনোভাব, অনুভূতি ইত্যাদি ব্যবস্থাপনার নিকট প্রেরিত হয়। ফলে তা সঠিক সিদ্ধান্ড়গ্রহণে সহায়ক হয়।

৪) **গঠনমুলক পরামর্শ ঃ** এর মাধ্যমে অধীনস্থ কর্মিগণ প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নতি বা কাজের পদ্ধতি সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদেরকে তাদের আন্তরিক ও গঠনমূলক পরামর্শ দিয়ে থাকে। ফলে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জন ও উন্নতি ত্বরান্বিত হয়।

৫) **প্রণোদনা ঃ** উর্ধ্বগামী যোগাযোগের অন্যতম সুবিধা হলো নিম্নপদস্থ কর্মিদের প্রেরিত পরামর্শ ও মতামত গৃহীত ও বাস্তবায়িত হলে তারা বিশেষভাবে উৎসাহিত হয়। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের প্রতি আন্তরিকতা ও কাজের উৎসাহ বাড়ে, এতে সাফল্য নিশ্চিত হয়।

৫) **পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন ঃ** কর্মিদের প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরী পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে উর্ধ্বগামী যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

৬) **অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি ঃ** এই ধরনের নিয়মিত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও অধীনস্থদের মধ্যে সু-সম্পর্ক সৃষ্টির সহায়ক হয়। ফলে সংগঠনের অনুকূল কার্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

উর্ধ্বগামী যোগাযোগের অসুবিধা বা সীমাবদ্ধতা ঃ উর্ধ্বগামী যোগাযোগের অনেকগুলো সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এই প্রকার যোগাযোগে নিম্নোক্ত অসুবিধা বিদ্যমান ঃ

১) **তথ্যের বিকৃতিঃ** এই ধরনের যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায়, অধনস্তগণ ইচ্ছাকৃতভাবে সঠিক তথ্যে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সরবারহ করেনা। ফলে প্রকৃত তথ্যের বিকৃতি ঘটে।

২) **অবজ্ঞা বা অবহেলা ঃ** প্রায়ইশ দেখা যায়, উর্ধ্ব ব্যবস্থাপনা এই ধরনের যোগাযোগের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের প্রতি তেমন গুরুত্ব প্রদান করেনা। ফলে প্রকৃত তথ্যের বিকৃতি ঘটে।

৩) **অপর্যাপ্ততাঃ** অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে উর্ধ্বগামী যোগাযোগের মাধ্যমে প্রেরিত প্রতিবেদন বা তথ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ থাকে। ফলে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করা দুরূহ হয়ে পড়ে।

৪) **তোষামদপ্রিয়তাঃ** অধস্তন কর্মিগণ সবসময় চেষ্টা করে বসের নিকট নিজেকে বা নিজেদের যোগ্য করা, ফলে তারা এমন ধরনের তথ্য প্রদান করে যা উপরওয়ালাকে খুশি করতে পারে। এতে করে প্রকৃত তথ্য বাদ পড়ার সম্ভাবনা থাকে এবং সংগঠনের অদক্ষতা দেখা যায়।

৫) **উপরওয়ালার অনীহাঃ** কিছু কিছু ক্ষেত্রে উপরওয়ালা বা বস্ পছন্দ করেনা। নিম্নস্তরের কর্মচারিরা তার সাথে যোগাযোগ করুক। ফলে প্রতিষ্ঠানের কাজে বাধার সৃষ্টি হয়।

নিম্নগামী ও উর্ধ্বগামী যোগাযোগের পার্থক্য ঃ বিভিন্ন প্রকার যোগাযোগের মধ্যে নিম্নগামী ও উর্ধ্বগামী যোগাযোগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নগামী যোগাযোগ হলো এমন এক ধরনের যোগাযোগ প্রক্রিয়া যাতে যে কোন সংবাদ, তথ্য, ধ্যান-ধারণা, চিন্তা বা নির্দেশনা সংগঠনের উচ্চস্তর হতে নিম্নস্তরে প্রেরিত হয়।

পক্ষান্তরে তথ্য, সংবাদ, সুপারিশ, অনুভূতি, ভাবাবেগ উদ্ধগামী যোগাযোগের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র পরিলক্ষীত হয়। সুতরাং প্রক্রিয়াগত দিক হতে এদের স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। নিম্নে এদের পার্থক্যের বর্ণনা করা হলো -

ভিত্তি	নিম্নগামী যোগাযোগ	উর্ধ্বগামী যোগাযোগ
১) পদ্ধতি	সংগঠন কাঠামোর উপর স্তর হতে যোগাযোগ নিচের স্তরে প্রবাহিত হলে তাকে নিম্নগামী যোগাযোগ বলা হয়।	অধীনস্তদের নিকট হতে যোগাযোগ উচ্চ পদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মচারির নিকট প্রেরিত হলে তাকে উর্ধ্বগামী যোগাযোগ বলা হয়।
২) গতি	নিম্নগামী যোগাযোগের গতি স্বাভাবিক।	উর্ধ্বগামীর ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নয়, বিপরীতমুখী।
৩) সংযোগ	অধীনস্তদের প্রতি নির্দেশাবলী স্বরূপ।	কর্মকর্তাদের নিকট অধীনস্থদের নিবেদন বা অভিযোগ।
৪) ব্যবহার	এই ধরনের যোগাযোগ অনেক বেশি সংগঠিত হয়।	উর্ধ্বগামী যোগাযোগের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম।

পাঠ সংক্ষেপ

- নিম্নগামী যোগাযোগ বলতে বুঝায় উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে তার অধীস্থ কর্মচারিদের যোগাযোগ।
- উর্ধ্বমুখী যোগাযোগে তথ্য প্রবাহ নিচ থেকে উপরের দিকে প্রবাহিত থাকে।
- ব্যবস্থাপনার সকল সিদ্ধান্ত সকল স্তরে পৌঁছানোর জন্য নিম্নগামী যোগাযোগ করা হয়।
- নিম্নগামী যোগাযোগের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো কর্মিদের তথ্য সরবরাহ করা, যাতে তারা তাদের স্বীয় দায়িত্ব ও প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কাজের সাথে নিজ কাজ ও দায়িত্বের সম্পর্ক সুষ্ঠুভাবে অনুধাবন করতে পারে।
- নিম্নগামী যোগাযোগের সুবিধাগুলোর মধ্যে কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি, নীতি ও পলিসি অবহিত করা, শৃঙ্খলা বজায় রাখা, সংগঠন কাঠামোর উন্নয়ন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।
- নিম্নগামী যোগাযোগের অসুবিধাগুলোর মধ্যে কর্মদক্ষতা, ফলাবর্তনের অভাব, মনোবল হারিয়ে ফেলা, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।
- উর্ধ্বগামী যোগাযোগের সুবিধাগুলো হলোঃ নিম্নগামী যোগাযোগের ফলাবর্তন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, গঠনমূলক পরামর্শ প্রভৃতি।
- উর্ধ্বগামী যোগাযোগের সীমাবদ্ধতা হচ্ছে তথ্যের বিকৃতি, অবজ্ঞা বা অবহেলা, তোষামদ প্রিয়তা প্রভৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন-

১। নিম্নগামী যোগাযোগের উদ্দেশ্য

ক. নির্দেশ প্রদান খ. তথ্য সংরক্ষণ

গ. কাজের প্রবাহ ঘ. কোনটি নয়।

২। যে যোগাযোগ ব্যবস্থায় তথ্য প্রবাহ নিচ থেকে উপরের দিকে প্রবাহিত হয় তাকে

ক. নিম্নগামী যোগাযোগ খ. উর্ধ্বগামী যোগাযোগ

গ. সমান্তরাল যোগাযোগ ঘ. লিখিত যোগাযোগ

৩। নিম্নগামী যোগাযোগের সুবিধা কোনটি-

ক. কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি খ. কর্মদক্ষমতা হ্রাস পায়

গ. ব্যাখ্যার অভাব ঘ. কোনটিই নয়

৪। উর্ধ্বগামী যোগাযোগের অসুবিধা কোনটি-

ক. তথ্যের বিকৃতি খ. উর্ধ্বতনের আগ্রহ

গ. পর্যাপ্ততা ঘ. কোনটিই নয়

৫। নিম্নগামী যোগাযোগের গতি-

ক. অস্বাভাবিক খ. স্বাভাবিক

গ. সমান্তরাল ঘ. কোনটিই নয়

পাঠ ৪ গমান্তরাল যোগাযোগ (Horizontal Communication)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- গমান্তরাল যোগাযোগের সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবেন;
- গমান্তরাল যোগাযোগের মাধ্যম বর্ননা করতে পারবেন; এবং
- গমান্তরাল যোগাযোগের সুবিধা ও অসুবিধা সমূহ নিরুপন করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

সমান্তরাল যোগাযোগের সংজ্ঞা ঃ আধুনিক যোগাযোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হলো সমান্তরাল যোগাযোগ। সমান্তরাল যোগাযোগ হল এমন এক বিশেষ ধরনের যোগাযোগ প্রক্রিয়া, যাতে যোগাযোগের বিষয়বস্তু ব্যবস্থপনা কাঠামোর অভ্যন্তত্বরে অবস্থিত বিভিন্ন নির্বাহীদের বা বিভাগের মধ্যে কার্য, নির্দেশ ও নীতির বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য প্রেরিত হয়। এটা দ্বি-মুখীও হতে পারে। এটা ব্যবস্থাপনা সোপানের সমপদে অধিষ্ঠিত বিভিন্ন ব্যক্তি অথবা বিভিন্ন শাখা ও বিভাগের মধ্যে আদান প্রদান করা হয়। যেমন- উৎপাদন ব্যবস্থাপক ও বণ্টন ব্যবস্থাপকের মধ্যে বার্তা আদান প্রদান করা হলে তাকে সমান্তরাল যোগাযোগ বলা যাবে।

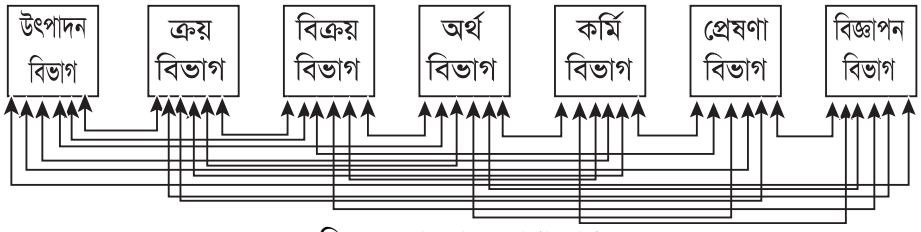

চিত্র : সমান্তরাল যোগাযোগ

সমান্তরাল যোগাযোগের মাধ্যম ঃ নিম্নের ছকের সাহায্যে সমান্তরাল যোগাযোগ মাধ্যমগুলো দেখানো হলো-

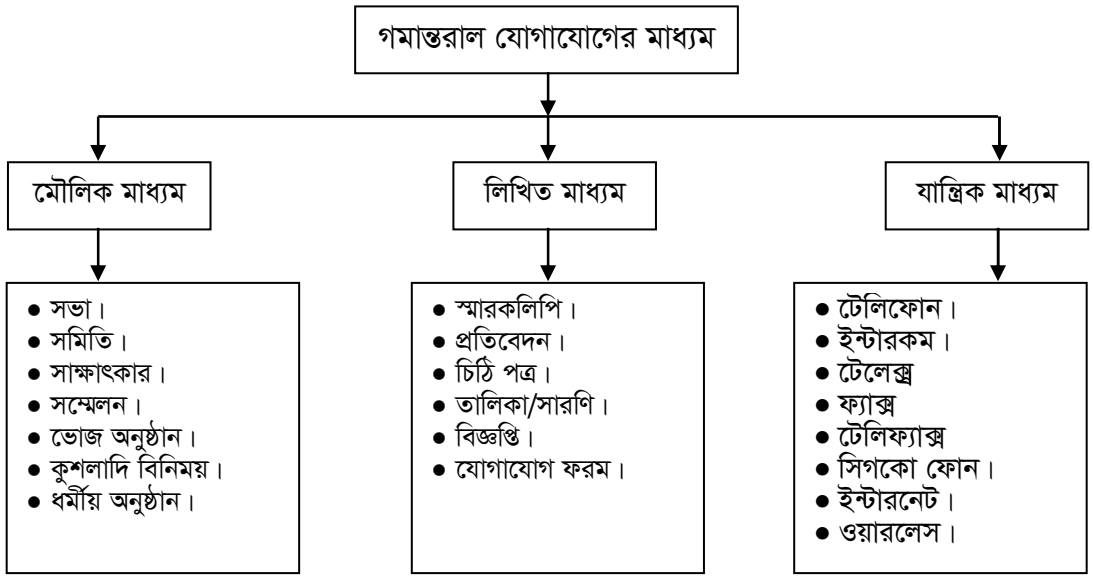

আধুনিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক বা সাংগঠনিক কাঠামো ভিত্তিতে সমান্তরাল যোগাযোগ আধুনিক ব্যবস্থাপনার বিশেষ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

গমান্তরাল যোগাযোগের সুবিধা বা গুরুত্ব ঃ নিম্নে সমান্তরাল যোগাযোগের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো-

১) **সু-সম্পর্ক ও সমঝোতা ঃ** সমান্তরাল যোগাযোগ প্রক্রিয়ার সমপর্যায়ের কর্মকর্তা বা সম-বিভাগের মধ্যে সম্পন্ন হয় বলে এক পক্ষ অন্য পক্ষের পরামর্শ ও সমঝোতার মাধ্যমে কাজ করেন। ফলে এদের মধ্যে সু-সম্পর্ক গড়ে উঠে।

২) **কাজের সমন্বয় সাধন ঃ** ব্যবসায়ের বিভিন্ন বিভাগ তাদের কার্যাবলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য সমান্তরাল যোগাযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩) **বিভাগীয় যোগাযোগের ক্ষেত্রে ঃ** বিভাগীয় যোগাযোগের ক্ষেত্রে সমান্তরাল যোগাযোগের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ, এতে করে সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী একটি বিভাগের সাথে অন্যান্য বিভাগের পর্যায় ক্রমিক ও প্রয়োজনীয় কার্যকর যোগাযোগ সংরক্ষণ করা যায়।

৪) **ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঃ** যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রায়ই বিশেষজ্ঞ ও তত্ত্বাবধায়কের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য বা ভুল বুঝাবুঝি হতে পারে। উন্নত সমান্তরাল যোগাযোগ এদের মধ্যকার ভুল বুঝাবুঝির অবসানে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

৫) **কার্যের স্বাভাবিক গতিশীলতা ঃ** এক্ষেত্রে সমান্তরাল যোগাযোগের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

৬) **স্বেচ্ছাচারিতা রোধ ঃ** এক্ষেত্রে সমান্তরাল যোগাযোগ অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গমান্তরাল যোগাযোগের অসুবিধা ঃ সমান্তরাল যোগাযোগের বেশ কতগুলো সুবিধা বা প্রয়োজনীয়তা থাকলেও এতে কতগুলো অসুবিধা বা সীমাবদ্ধতা আছে। নিম্নে তা বর্ননা করা হলো-

১) **সহযোগিতার অভাব ঃ** সহেযোগিতা বৃদ্ধির জন্য এরূপ যোগাযোগ প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হলেও কার্যত দেখা যায় প্রায়ই কর্মি ও বিভাগের মধ্যে অসহযোগিতার সৃষ্টি হয়।

২) **পদমর্যাদাগত সমস্যা ঃ** একারণে সমান্তরাল যোগাযোগ প্রায়ই ব্যর্থ হয়। এর অন্যতম কারণ সমপদমর্যাদার দুই ব্যক্তির মধ্যে সু-সম্পর্কের অভাব।

৩) **পদ্ধতিগত জটিলতা ঃ** বিভিন্ন কারণে এধরনের যোগাযোগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব ঘটায়।

৪) **তথ্য প্রবাহে বিঘ্নের সৃষ্টি ঃ** কখনও কখনও সাংগঠনিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তর পার হয়ে তথ্য প্রবাহকালে তথ্যের বিকৃতি বা বাধার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

৫) **কার্যের বিভাগীকরণ ঃ** কার্যের সমন্বয়সাধনের ক্ষেত্রে সমান্তরাল যোগাযোগের গুরুত্ব অনস্বীকার্য হলেও সাংগঠনিক কাঠামো বিভিন্ন স্তর এবং কার্যের উপ-বিভাজন প্রক্রিয়া প্রায়ই সমান্তরাল যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

পাঠ সংক্ষেপ

- গমান্তরাল যোগাযোগ হল এমন এক বিশেষ ধরনের যোগাযোগ প্রক্রিয়া যাতে যোগাযোগের বিষয়বস্তু ব্যবস্থপনা কাঠামোর অভ্যন্তরে অবস্থিত বিভিন্ন নির্বাহীদের বা বিভাগের মধ্যে কার্য, নির্দেশ ও নীতির বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য প্রেরিত হয়।
- গমান্তরাল যোগাযোগের প্রধান মাধ্যমগুলো হলো মৌলিক, লিখিত মাধ্যম, ও যান্ত্রিক মাধ্যম।
- গমান্তরাল যোগাযোগের সুবিধাসমূহ হলো সুসম্পর্ক ও সমঝোতা, কাজের সমন্বয় সাধন, ভুল বোঝাবুঝির অবসান, কার্যের স্বাভাবিক গতিশীলতা, ও স্বেচ্ছাচারিতা রোধ।

- গমান্তরাল যোগাযোগের অসুবিধাসমূহ হলো সহযোগিতার অভাব, পদ মর্যাদাগত সমস্যা, তথ্য প্রবাহে বিঘ্নের সৃষ্টি ও কার্যের বিভাগী করনের প্রতিবন্ধকতা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন-

১। উৎপাদন ব্যবস্থাপক ও বণ্টন ব্যবস্থাপকের মধ্যে বার্তা আদান প্রদান করা হলে তাকে

ক. উলম্ব যোগাযোগ　　খ. সমান্তরাল যোগাযোগ

গ. একমুখী যোগাযোগ　　ঘ. অন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ

২। সমান্ড়রাল যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম কয়টি?

ক. দুইটি　　খ. তিনটি

গ. চারটি　　ঘ. ছয়টি

৩। নিম্নের কোনটি সমান্তরাল যোগাযোগের মৌলিক মাধ্যম?

ক. সভা　　খ. প্রতিবেদন

গ. বিজ্ঞপ্তি　　ঘ. ফ্যাক্স

৪। নিম্নের কোনটি সমান্তরাল যোগাযোগের লিখিত মাধ্যম?

ক. সমিতি　　খ. টেলিফোন

গ. চিঠিপত্র　　ঘ. ইন্টারনেট

৫। নিম্নের কোনটি সমান্তরাল যোগাযোগের যান্ত্রিক মাধ্যম?

ক. টেলিফোন　　খ. স্মারকলিপি

গ. সম্মেলন　　ঘ. কোনটি নয়।

অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক যোগাযোগ (Internal and External Communication)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক যোগাযোগের সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবেন;
- অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক যোগাযোগের পদ্ধতি এবং মাধ্যম বর্ণনা করতে পারবেন;
- অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক যোগাযোগের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন; এবং
- অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক যোগাযোগের পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের সংজ্ঞা ঃ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে এক ব্যক্তির সাথে অন্য ব্যক্তির অথবা এক বিভাগের সাথে অন্য বিভাগের উর্ধ্বতন বা অধস্তন কর্মিদের মধ্যে সাংগঠনিক বিষয়ে যে যোগাযোগ প্রক্রিয়া প্রচলিত থাকে তাকে অভ্যন্তরীণ বা আন্তঃ-যোগাযোগ বলে।

মিঃ এস,পি অরোরার মতে, "উর্ধ্বতন নির্বাহী ও অধস্তন কর্মিদের মধ্যে সংবাদ বা তথ্যের আদান প্রদানকে অভ্যন্তরীন যোগাযোগ বলা হয়"।

বাহ্যিক যোগাযোগের সংজ্ঞা ঃ অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ন্যায় বাহ্যিক যোগাযোগও একটি প্রতিষ্ঠানের সমান গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই বাইরের পৃথিবীর সাথে নানা কারণে যোগাযোগ করে থাকে। বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, ব্যাংকিং কোম্পানী, বীমা কোম্পানি, সরকারি এজেন্সি, চেম্বার অব কমার্স, বিভিন্ন পাওনাদার ও দেনাদার, শেয়ারহোল্ডার প্রমুখের সাথে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ করতে হয়। প্রতিষ্ঠানের বাইরে বহিবিশ্বে নিজের কার্যাবলি প্রচার করে সুনাম বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে যে সব যোগাযোগ করা হয় তাকে বাহ্যিক যোগাযোগ বলে।

অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের মাধ্যম/ পদ্ধতি ঃ অভ্যন্তরীণ যোগাযোগর প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বা পদ্ধতি নিম্নে বর্ণিত হলো-

১) **স্মারকপত্র ঃ** এটা অফিসিয়াল কায়দায় অফিসের কর্মচারিদের নিকট প্রদান করা হয়। স্মারকপত্রে সম্বোধন সূচক শব্দাদি ব্যবহার করা হয়না।

২) **নির্দেশনা বই ঃ** বৃহদায়তন শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে সাধারণত নির্দেশনা পুস্তিকা ছাপানো হয় যাতে তাদের বিভিন্ন বিভাগের কার্য-প্রণালীর বর্ণনা থাকে।

৩) **টেলিফোন ঃ** এই পদ্ধতিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে উর্ধ্বতন স্তর হতে নিম্নস্তরে কোন নির্দেশনা বা তথ্য প্রেরণ করা হয়।

৪) **ইন্টারকম ঃ** ইন্টারকামের সাহায্যে পদস্থ কর্মিরা নিজ নিজ সিটে বসে মৌখিক যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে।

৫) **সাক্ষাৎকার ঃ** সাক্ষাৎকার অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের একটি উপায়। এর সাহায্যে শ্রমিক-কর্মি সম্পর্ক স্থাপন ভুল সংশোধন, ভুল বুঝাবুঝি ও মতানৈক্যের অবসান ঘটানো যায়।

৬) **কথোপকথন ঃ** কথোপকথন এর মধ্যমে সংগঠনের ব্যবস্থাপক ও শ্রমিক-কর্মিদের মধ্যে তথ্য ও ভাবের আদান প্রদান হয়।

৭) **প্রতিবেদন ঃ** প্রতিবেদনের মাধ্যমে ও যে কোন বিষয় অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ হতে পারে।

৮) **সুপারিশ ঃ** অনেক সময় বিশেষ কমিটি বা অধস্থ কর্মিরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট বিবৃতির মাধ্যমে নির্দিষ্ট বিষয়ে তাদের সুপারিশ করে।

৯) **প্রশিক্ষণ গাইড ঃ** প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ গাইড বা পুস্তিকার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ হতে পারে।

বাহ্যিক যোগাযোগের প্রক্রিয়া/পদ্ধতি ঃ বাহ্যিক যোগাযোগ লিখিত বা মৌখিক যে কোন ধরনের হতে পারে। তাছাড়া যে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বাহ্যিক যোগাযোগ রক্ষা করা যায়, নিম্নে তাদের কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো ঃ

১) **বিজ্ঞাপন ও প্রচার ঃ** প্রতিষ্ঠানের সকল বিষয়বলি জনসাধারণ ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানানোর প্রথম ও প্রধান মাধ্যম হলো বিভিন্ন প্রকারের বিজ্ঞাপন ও প্রচার।

২) **গণ-মাধ্যমের ব্যবহার ঃ** কম সময়ে ও খরচে অসংখ্য জনগনের নিকট প্রতিষ্ঠানের তথ্যাবলি পৌঁছে দেওয়ার অন্যতম সহজ ও সরল বাহন হলো বিভিন্ন প্রকারের গণ-মাধ্যমের ব্যবহার। যেমন-সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা ইত্যাদি।

৩) **তথ্য সরবরাহমূলক সেবা ঃ** অনেক সময় বাহ্যিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে কোন কোন প্রতিষ্ঠান গ্রাহকদের বিক্রয় উত্তর সেবা প্রদানের জন্য পণ্যদ্রব্যের বিস্তারিত বর্ণনা পূর্বক পুস্তিকা, প্রচারপত্র, কার্ড ইত্যাদি জনগনের নিকট বিতরণ করে।

৪) **মুক্তদিন ও কারখানা পরিদর্শন ঃ** ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান ও জনগণের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য কোন কোন প্রতিষ্ঠান জনগণের প্রদর্শনের জন্য খুলে দেয়।

অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীতা ঃ আধুনিক জটিল ও প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়ী বিশ্বে, বিশেষত বৃহদায়তন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে একটি অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ প্রক্রিয়ার গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিম্নে এ মাধ্যমের বিভিন্ন প্রকার গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হলো-

১) **তথ্য প্রেরণ ঃ** একটি কার্যকর অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবসার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরে সহজে পরিকল্পনা, নীতি ও কর্মপ্রণালী সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রেরণ করা সম্ভব।

২) **প্রয়োজনীয় নির্দেশ ঃ** কার্যসম্পাদন সম্পর্কে উপরের স্তর হতে নিম্নস্তরের কর্মিদের মধ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রেরণের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ একান্ত প্রয়োজন।

৩) **ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ঃ** এই প্রক্রিয়ায় প্রেরিত তথ্য বা নির্দেশ সম্পর্কে প্রয়োজনে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়।

৪) **সমন্বয়সাধন ঃ** প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনের জন্য সাংগঠনের প্রতিটি বিভাগ ও শ্রমিক-কর্মিদের কার্যের মধ্যে সমন্বয়সাধন করার জন্য এই প্রক্রিয়ার বিকল্প নেই।

৫) **সুসম্পর্ক ও সহযোগিতা বৃদ্ধি ঃ** এর মাধ্যমে সকলের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে প্রতিষ্ঠানের অভীষ্ট লক্ষ্যের সহযোগীতা বৃদ্ধি করা যায়।

৬) **কর্মিদের প্রেষণাদান ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ঃ** এ যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় অধস্তন কর্মিদেরকে কর্মে আগ্রহী করে তোলা হয়; ফলে তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

৭) **প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ঃ** এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।

৮) **নিয়ন্ত্রণ ঃ** প্রতিষ্ঠানের সকল স্ড়রের উপর পর্যায়ক্রমিক ও কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম।

৯) **সুনাম বৃদ্ধিঃ** ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নিশ্চিতের পাশাপাশি সুনাম বৃদ্ধিতেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

বাহ্যিক যোগাযোগের গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য ঃ নিম্নে বাহ্যিক যোগাযোগের উদ্দেশ্য বা গুরুত্ব তথা এর দ্বারা বিভিন্ন পক্ষগুলো কিভাবে উপকৃত হয়, তা ব্যাখ্যা করা হলো-

১) **সরবারহকারীঃ** ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে পণ্যদ্রব্য, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের জন্য বিভিন্ন প্রকার সরবারহকারীর সাথে উত্তম যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়।

২) **বিনিয়োগকারীঃ** ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে মূলধন ও ঋণ সংগ্রহের জন্যও বিনিয়োগকারী এবং ঋণদাতাদের সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ করতে হয়।

৩) **বাজারঃ** ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে কেবল উৎপাদন করলেই চলবে না, উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য বিক্রির জন্য বাজারও সৃষ্টি করতে হবে এবং তা একমাত্র সম্ভব বাহ্যিক যোগাযোগের মাধ্যমে।

৪) **শ্রমিক-কর্মিঃ** শুধুমাত্র প্রচুর মূলধন, আধুনিক যন্ত্রপাতি হলেই সফলভাবে ব্যবসা পরিচালনা সম্ভব করা হয় না। উত্তম বাহ্যিক যোগাযোগের মাধ্যমে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সহজেই দক্ষ ও নিষ্ঠাবান শ্রমিক কর্মিকে প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে আগ্রহী করে তুলতে পারে।

৫) **সরকারের বিভিন্ন বিভাগঃ** বাহ্যিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মাধ্যমে অহরহ যোগাযোগ করতে হয়।

৬) **সমাজঃ** তদুপরি সমাজের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যবসায়কে প্রয়োজনীয় আনুকূল্য ও স্বীকৃতি লাভের জন্য কার্যকর যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। এটা ব্যবসায়ীকে সাফল্য লাভে সহায়তা করে।

অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক যোগাযোগের পার্থক্য ঃ অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক যোগাযোগের মধ্যে নিম্নোক্ত পার্থক্য দেখা যায়-

১) **সংজ্ঞাগত পার্থক্য ঃ** একটি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে কর্মরত বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে তথ্যাদি বিনিময় হওয়াকে অভ্যন্ড়রীণ যোগাযোগ বলে। পক্ষান্তরে প্রতিষ্ঠানের ভিতর কর্মরত নন এমন ধরনের বাইরের ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা হলে তা বাহ্যিক যোগাযোগ নামে পরিচিত।

২) **প্রকৃতিগত পার্থক্য ঃ** অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ অন্ড়মুখী; বাহ্যিক যোগাযোগ বহির্মূখী।

৩) **উদ্দেশ্যের পার্থক্য ঃ** প্রাতিষ্ঠানিক কাজকর্মের গতি প্রবাহ ও সাবলীলতা বজায় রাখা হলো অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের মুখ্য উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে, বাহ্যিক যোগাযোগের প্রধান উদ্দেশ্য হলো প্রতিষ্ঠানের বাইরে বহিবিশ্বে এর সুনাম বৃদ্ধি ও লক্ষ্য অর্জন করা।

৪) **উপকারিতা ঃ** অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের কাজের নৈপূণ্য বৃদ্ধি করে, পারস্পরিক তথ্য বিনিময়ে সহায়তা করে।

৫) **যোগাযোগ পদ্ধতি ঃ** স্মারকলিপি, নির্দেশনা পুস্তিকা, টেলিফোন, কথোপকথন, বুলেটিন, চিঠিপত্র ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের উল্লেখযোগ্য মাধ্যম। পক্ষান্তরে, রেডিও টেলিভিশনে সম্প্রচার, পত্র পত্রিকা, নিয়ন সাাইনের ব্যবহার, বিলবোর্ড ইত্যাদি বাহ্যিক যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম।

পাঠ সংক্ষেপ

- প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে এক ব্যক্তির সাথে অন্য বক্তির যে যোগাযোগ তাকে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ বলে।
- প্রতিষ্ঠানের বাইরে নিজের কার্যাবলী প্রচার করে সুনাম বৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে সে যোগাযোগ করা হয়, তাকে বাহ্যিক যোগাযোগ বলে।
- অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমগুলো হলো স্মারকপত্র, নির্দেশনা বই, টেলিফোন, ইন্টারকম, সাক্ষাৎকার, কথোপকথন, প্রতিবেদন, সুপারিশ এবং প্রশিক্ষণ গাইড।
- বাহ্যিক যোগাযোগের প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিগুলো হলোঃ বিজ্ঞাপন ও প্রচার, গণমাধ্যমের ব্যবহার, তথ্য সরবরাহমূলক সেবা, মুক্তদিন ও কারখানা পরিদর্শন।
- অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তাগুলো হলোঃ তথ্য প্রেরণ, প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ, ব্যাখা বিশ্লেষণ, সমন্বয়সাধন, সুসম্পর্ক ও সহযোগিতা বৃদ্ধি, কর্মিদের প্রেষণাদান ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, নিয়ন্ত্রণ ও সুনাম বৃদ্ধি।
- বাহ্যিক যোগাযোগের গুরুত্ব ও উদ্দেশ্যগুলো হলোঃ সরবরাহকারী, বিনিয়োগকারী, বাজার, শ্রমিক কর্মি, সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও সমাজ। অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ অন্তমুখী, বাহ্যিক যোগাযোগ বর্হিমুখী, প্রাতিষ্ঠানিক কাজকর্মের গতি প্রবাহে সাবলীলতা বজায় রাখা হলো আভ্যন্তরীণ যোগাযোগের মূখ্য উদ্দেশ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন-

১. অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ

ক. বহির্মুখী　　খ. অন্তর্মুখী

গ. অন্তর্মুখী　　ঘ. কোনটিই নয়।

২. নিম্নের কোনটি অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের মাধ্যম?

ক. স্মারকপত্র　　খ. বিজ্ঞাপন

গ. গণ-মাধ্যম　　ঘ. কোনটিই নয়

৩. বাহ্যিক যোগাযোগের পদ্ধতি কোনটি?

ক. প্রতিবেদন　　খ. টেলিফোন

গ. বিজ্ঞাপন ও প্রচার　　ঘ. সাক্ষাৎকার

৪. অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের অন্যতম প্রধান গুরুত্ব হলো।

ক. তথ্য প্রেরণ　　খ. সরবরাহ

গ. বাজার　　ঘ. কোনটিই নয়

৫. বাহ্যিক যোগাযোগের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলোঃ

ক. সরবারহকারী　　খ. নির্দেশ প্রদান

গ. ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ　　ঘ. টেলিফোন

৬. বাহ্যিক যোগাযোগের মাধ্যম নয় কোনটি?

ক. পত্র-পত্রিকা　　খ. বিলবোর্ড

গ. টেলিভিশন সম্প্রচার　　গ. টেলিফোন

আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ (Formal and Informal communication)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবেন;
- অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের সুবিধাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের অসুবিধাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন; এবং
- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের পার্থক্য করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের সংজ্ঞা ঃ প্রতিষ্ঠানের ভিতরে যে সব তথ্য বিনিময় প্রক্রিয়া অফিসিয়ালী অনুমোদিত হয় তাকে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ বলে। আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ ব্যবস্থা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থারই নামান্তর। কারণ, এরূপ যোগাযোগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সমস্যাবলী ও সমস্যার সাথে সম্পর্কিত তথ্যাদি ব্যবস্থাপকদের সামনে উপস্থিত করা হয়। ব্যবস্থাপকগণ সেই তথ্যের আলোকে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই ভাবে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে।

অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের সংজ্ঞা ঃ প্রতিষ্ঠানের ভিতরে বা বাইরে প্রতিষ্ঠানের বিষয়াদি সম্পর্কিত যে সব যোগাযোগ হয় যা অফিসিয়ালী অনুমোদিত নয় বা যা আনুষ্ঠানিকভাবে করা যায় না, তাকে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ বলা হয়। আন অফিসিয়াল চ্যানেলর মাধ্যমে তথ্য বিনিময়ের জন্য অনানুষ্ঠানিক সম্পর্কে গড়ে উঠে এবং অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের উৎপত্তি হয়। যখন অনেক লোক একই স্থানে একত্রে মিলে মিশে কাজ করে তখন সেখানে স্বাভাবিক নিয়মে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের সৃষ্টি হয়।

অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের সুবিধাসমূহ ঃ যদিও অনেকে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ পছন্দ করেনা, তথাপি এ পদ্ধতির মাধ্যমে সংবাদ, তথ্য, ভাব, চিন্তা প্রভৃতি আদান-প্রদানে নিম্নের সুবিধাসমূহ লক্ষণীয় ঃ

১) **নির্দেশনাবলীর দ্রুত প্রচার ও ব্যাখা প্রদান ঃ** এটা উচ্চ ব্যবস্থাপনার আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে প্রেরিত নির্দেশাবলী দ্রুত প্রচার, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণে বিশেষ সাহায্য করে।

২) **বিকল্প পদ্ধতি ঃ** ব্যবস্থাপনা কোন সংবাদ আদান-প্রদানে ব্যর্থ হলে এটা আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির উপযুক্ত বিকল্প হিসেবে কাজ করে।

৩) **মনোভাবের সহজ প্রকাশ ঃ** এটা কর্মিদের মনোভাব, অভিযোগ ও আবেগ মৌখিকভাবে পরস্পরের নিকট নির্ভয়ে প্রকাশ করতে সাহায্য করে।

৪) **যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঃ** এটা সাংগঠনের বিভিন্ন অংশে ও স্তরে সঠিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করে।

৫) **সম্পর্কের উন্নয়ন ঃ** এটা সংগঠনের উন্নত ব্যবস্থাপনা ও শ্রম-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কের উন্নয়নে সাহায্য করে।

৬) **সমস্যা সমাধানের উপায় ঃ** এর মাধ্যমে সংগঠনের ও কর্মিদের সমস্যা সমাধানের উপায় বাতলে দেয়।

৭) **সহযোগিতা ও সম্পর্ক ঃ** এটা পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন তথ্যাবলি বিনিময়ের মাধ্যমে এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলে। ফলে সংগঠনের বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা এবং সমন্বয় সহজ ও দ্রুততর হয়।

অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের অসুবিধাসমূহ ঃ নিম্নে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের অসুবিধা উল্লেখ করা হলো-

১) **তথ্য বা ভাবে বিকৃতি ঘটায় ঃ** এই ব্যবস্থায় যোগাযোগের মূলভাব বা অর্থ প্রায়ই বিকৃত হতে দেখা যায়।

২) **গুজবের জন্ম দেয় ঃ** এটা প্রায়ই সংগঠনে বিকৃত তথ্য ও গুজবের জন্ম দেয়।

৩) **অবাঞ্চিত বিরোধীদের সৃষ্টি করে ঃ** এটা সংগঠনের ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিক কর্মিদের মধ্যে গুরুত্বহীন ও অবাঞ্চিত বিরোধ ও পার্থক্যের সৃষ্টি করে।

৪) **কষ্টকর নিয়ন্ত্রণ ঃ** এ পদ্ধতির যোগাযোগ কাঠামো নিয়ন্ত্রণ খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

৫) **গোপনীয়তা ফাঁস ঃ** এভাবে যোগাযোগের মাধ্যমে গোপনীয়তা রক্ষা করা অসম্ভব।

৬) **ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করে ঃ** এটা সংগঠনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা যথাযথভাবে অনুসরণ করেনা বলে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়।

৭) **অসহযোগিতার সৃষ্টি ঃ** এটা প্রায়ই বিকৃত গুজব, অবাধ্যতা ও সাংগঠনিক রীতি বর্জনের মাধ্যমে সামাজিক চক্র ও কোটারী গ্রুপের জন্ম দেয়, যা অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে সংগঠনের মধ্যে বিরোধ ও অসহযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি করে। ফলে কার্যদক্ষতা হ্রাস পায়।

আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের মধ্যে পার্থক্য

আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ, যোগাযোগ প্রক্রিয়ার দুটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলেও এদের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান নিম্নে এদের মধ্যকার পার্থক্য আলোচনা করা হলো-

আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ	অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ
১। এ ধরনের যোগাযোগ সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।	১। এর মাধ্যমে সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।
২। এ ধরনের যোগাযোগ অফিসিয়াল নিয়ম কানুন ও রীতিনীতি মেনে চলে।	২। প্রাতিষ্ঠানিক কায়দা বা নিয়মকানুন ছাড়াই এই যোগাযোগ সম্পাদন করা হয়।
৩। আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের সু-নির্ধারিত পদ্ধতি আছে।	৩। একই সাথে উঠা-বসা চলাফেরা করার সময় অথবা খেলার মাঠে, ভ্রমণকালে বা খাওয়ার টেবিলে কর্মিদের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়।
৪। আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের সহায়ক হিসেবে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ ব্যবহৃত হয়।	৪। অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের সহায়ক নয়।
৫। এ ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা সৌহার্দ্যপূর্ণ শ্রম ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেনা।	৫। সৌহার্দ্যপূর্ণ শিল্প সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের গুরুত্ব অত্যাধিক।

পাঠ সংক্ষেপ

- প্রতিষ্ঠানের ভিতরে যেসব তথ্য অফিসিয়ালী আদান প্রদান করা হয় তাকে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ বলে।
- আনুষ্টানিকভাবে প্রতিষ্ঠানের ভিতরে বা বাইরে প্রতিষ্ঠানের বিষয়াদি সম্পর্কিত যে সব যোগাযোগ হয় তাকে অনুনাষ্ঠনিক যোগাযোগ বলা হয়।
- অনানুষ্ঠনিক যোগাযোগের উল্লেখযোগ্য সুবিধাসমূহঃ নির্দেশনাবলীর দ্রুত প্রচার ও ব্যাখ্যা প্রদান, বিকল্প পদ্ধতি, মনোভাবের সহজ প্রকাশ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সম্পর্কের উন্নয়ন, সমস্যা সমাধানের উপায় এবং সহযোগিতা ও সম্পর্ক।
- আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের অসুবিধাগুলো হলোঃ তথ্য বা ভাবে বিকৃত ঘটা, গুজবের জন্ম দেওয়া, অবাঞ্চিত বিরোধের সৃষ্টি করা, কষ্টকর নিয়ন্ত্রণ, গোপনীয়তা ফাঁস, ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হওয়া, অসহযোগিতার সৃষ্টি।
- আনুষ্ঠানিক যোগাযোগে সদস্যদের আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক ও অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের সদস্যদের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।
- আনুষ্ঠানিক যোগাযোগে সুনির্ধারিত পদ্ধতি আছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন-

১। প্রতিষ্ঠানের ভিতরে যে সব তথ্য অফিসিয়ালী আদান-প্রদান হয় তাকে বলে-

ক. সমান্তরাল যোগাযোগ　　খ. অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ

গ. আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ　　ঘ. লিখিত যোগাযোগ

২। আনুষ্ঠানিকভাবে সে যোগাযোগ করা হয় না তাকে বলে-

ক. আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ　　খ. অনানুষ্ঠনিক যোগাযোগ

গ. উলম্ব যোগাযোগ　　ঘ. সমান্তরাল যোগাযোগ

৩। নিম্নের কোনটি অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের সুবিধা

ক. সম্পর্ক উন্নয়ন　　খ. কষ্টকর নিয়ন্ত্রণ

গ. তথ্য বিকৃতি　　ঘ. গোপনীয়তা

৪। আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ আছে-

ক. অনির্ধারিত পদ্ধতি　　খ. সুনির্ধারিত পদ্ধতি

গ. অবলোকন পদ্ধতি　　ঘ. কোনটিই নয়।

৫। নিম্নের কোনটি অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের অসুবিধা-

ক. তথ্যের বিকৃতি　　খ. সঠিক নিয়ন্ত্রণ

গ. গোপনীয়তা রক্ষা　　ঘ. বিকল্প পদ্ধতি

একমুখী যোগাযোগ ও দ্বিমুখী যোগাযোগ (One way communication & Two way communication)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- একমুখী যোগাযোগের সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবেন;
- দ্বি-মুখী যোগাযোগের সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবেন; এবং
- দ্বি-মুখী যোগাযোগের সুবিধা ও অসুবিধা বণর্না করতে পারবেন

বিষয়বস্তু

একমুখী যোগাযোগ ঃ যোগাযোগ একদিকে অথবা দুই দিকে কার্যত সম্পাদিত হতে পারে। যে প্রেরক বা সংবাদদাতা শুধুমাত্র সংবাদগ্রাহকের কাছে বার্তা পৌঁছায় তাকে একমুখী যোগাযোগ বলে। এ যোগাযোগ ব্যবস্থায় গ্রাহক এর নিকট হতে কোন প্রত্যুত্তরে আশা করা হয় না । একমুখী যোগাযোগই তথ্য শুধুমাত্র একদিকে ধাবিত হয়। যেমন-রেডিও বা টেলিভিশন সংবাদ প্রবাহ বা একজন কর্মকর্তা তাঁর তথ্য প্রেরণ করে কিন্তু, তথ্যের প্রত্যুত্তর এর সুযোগ দেয় না, এরকম যোগাযোগ হলো একমুখী যোগাযোগ।

চিত্র ঃ একমুখী যোগাযোগ

দ্বি-মুখী যোগাযোগের সংজ্ঞা ঃ যোগাযোগের ক্ষেত্রে দ্বি-মুখী যোগাযোগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত লাভ করেছে। **"দ্বি-মুখী যোগাযোগ"** কথাটির দ্বারা যোগাযোগের সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে বুঝানো হয়েছে। এর দ্বারা প্রকৃত পক্ষে যোগাযোগের দ্বি-মুখী প্রক্রিয়াকে বা গতিকে নির্দেশ করা হয়। অর্থাৎ দ্বি-মুখী যোগাযোগ হলো উর্ধ্বগামী ও নিম্নগামী যোগাযোগের একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া যা ব্যবস্থাপনার উচ্চস্তর হতে কোন সংবাদ, তথ্য, নির্দেশ, নীতি পদ্ধতি ইত্যাদিকে নিম্নস্তরে পাঠানো হয় এবং প্রাপক উক্ত সংবাদ বা তথ্যের প্রতি উত্তর প্রেরকের নিকট পাঠিয়ে দেয়।

বস্তুত দ্বি-মুখী যোগাযোগ যোগাযোগের সাথে সম্পৃক্ত উভয় পক্ষকে জড়িত করে যোগাযোগের প্রক্রিয়াকে সামগ্রিক ও পরিপূর্ণ রূপদান করে। মূলত দ্বি-মুখী যোগাযোগ বলতে স্বয়ং সম্পূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বুঝিয়ে থাকে।

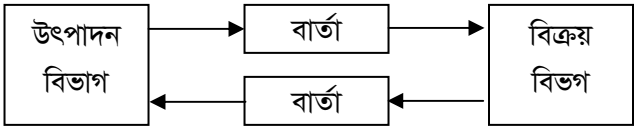

চিত্র ঃ দ্বি-মুখী যোগাযোগ

দ্বি-মুখী যোগাযোগের সুফল বা সুবিধাসমূহ বা গুরুত্ব ঃ অন্য যে কোন ধরনের যোগাযোগের তুলনায় দ্বি-মুখী যোগাযোগ অনেক সুবিধাজনক। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

১) **একীভূতকরণ ঃ** দ্বি-মুখী যোগাযোগের সাথে সংশি- ষ্ট উভয় পক্ষকে একীভূত করতে পারে। ফলে বার্তাপ্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে দ্রুত ও সহজে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যা প্রতিষ্ঠানের উন্নত ব্যবস্থাপনার সূচনা করে।

২) **গতিশীলতা ঃ** এই প্রক্রিয়া প্রেরকের নিকট হতে প্রাপকের নিকট সংবাদ, তথ্য, নির্দেশ, ভাব, চিন্তা, প্রভৃতি দ্রুত আদান প্রদানের মাধ্যমে সুষ্ঠু ও গতিশীল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে।

৩) **প্রনোদনা ও শিল্প সম্পর্ক ঃ** কর্মি-প্রণোদনার ব্যাপারে দ্বি-মুখী যোগাযোগ কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

৪) **উন্নত সম্পর্ক স্থাপন ঃ** এটা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা এবং শ্রমিক কর্মিদের মধ্যে উন্নত সম্পর্ক স্থাপন করতে ও বজায় রাখতে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

৫) **ভুল বুঝাবুঝির সমাধান ঃ** এই প্রক্রিয়ায় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির অবসান সহজ হয়।

৬) **প্রতিক্রিয়া জানা যায় ঃ** বস্তুত ব্যবস্থাপনার কাজ হলো অধীনস্তদের দ্বারা অভীষ্ট লক্ষ্যার্জনের জন্য সর্বাধিক কাজ আদায় করে নেওয়া এবং দ্বি-মুখী যোগাযোগের মাধ্যমে অধীনস্ড়দের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করা যায়।

৭) **দ্রুত কার্যসম্পাদন ঃ** এই প্রক্রিয়ায় দ্রুত কার্য সম্পাদন করা যায়, কেননা এই প্রক্রিয়ায় শ্রমিক-কর্মিগণ কেবলমাত্র ব্যবস্থাপনার প্রেরিত আদেশ নির্দেশ পালন করে না, উক্ত বিষয়ে তাদের সুপারিশ ও তাদের প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ করার সুযোগ পায়।

দ্বি-মুখী যোগাযোগের অসুবিধা বা সীমাবদ্ধতাসমূহ ঃ দ্বি-মুখী যোগাযোগ একক ভাবে কতগুলো সুবিধাই ভোগ করেনা। এর বিশেষ কতগুলো অসুবিধাও আছে। নিম্নে এদের বর্ণনা দেওয়া হলো-

১) এটা সময় সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল।

২) এটা অধস্ড়ন কর্মচারিদের মধ্যে অবাধ্যতার মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে, যা প্রতিষ্ঠানের নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে কাজের পরিবেশ নষ্ট করে।

৩) উচ্চ স্ড়রের ব্যবস্থাপনা হতে নিম্নস্তরের শ্রমিক-কর্মিদের নিকট প্রেরিত যোগাযোগের বিষয়বস্তুর প্রত্যুত্তর পুনরায় প্রেরকের নিকট ফেরত আসতে ব্যবস্থাপনার সাংগঠনিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তর অতিক্রমে নানা প্রকার জটিলতা সৃষ্টি করে।

৪) এই ব্যবস্থায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি যোগাযোগ বাস্তবায়নে বাঁধার সৃষ্টি করে যা কাজের গতি শ্লথ করে।

৫) এই প্রক্রিয়ায় প্রেরিত বার্তার অনেক সময় ভুল ব্যাখ্যা করা হয়।

পাঠ সংক্ষেপ

- একমুখী যোগাযোগে তথ্য শুধুমাত্র একদিকে ধাবিত হয়।
- দ্বি-মুখী যোগাযোগ হলো উর্ধ্বমুখী ও নিম্নমুখী যোগাযোগের একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া।
- দ্বি-মুখী যোগাযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট উভয় পক্ষকে একত্রীভূত করা যায়।
- দ্বি-মুখী যোগাযোগের সুফল বা সুবিধাসমূহ হলোঃ একীভূতকরণ, গতিশীলতা, প্রণোদণা ও শিল্প সম্পর্ক, উন্নত সম্পর্ক স্থাপন, ভুল বুঝাবুঝির সমাধান, প্রতিক্রিয়া জানা ও দ্রুত কার্যসম্পাদন।
- দ্বি-মুখী যোগাযোগের অসুবিধা বা সীমাবদ্ধতাসমূহ ঃ সময় সাপেক্ষ, অধস্তনদের অবাধ্যতা, কাজের গতি শ্লথ, বার্তার ভুল ব্যাখ্যা প্রভৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন-

১। সে যোগাযোগের শুধুমাত্র তথ্য প্রেরণ করা হয় কিন্তু তথ্যের প্রভুত্তরের সুযোগ দেওয়া হয়না তাকে বলে-
ক. দ্বি-মুখী যোগাযোগ খ. উর্ধ্বমুখী যোগাযোগ
গ. একমুখী যোগাযোগ ঘ. নিম্নমুখী যোগাযোগ

২। স্বয়ং সম্পূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে বুঝায়-
ক. দ্বি-মুখী যোগাযোগ খ. একমুখী যোগাযোগ
গ.সমান্তরাল যোগাযোগ ঘ. কোনটিই নয়

৩। নিম্নের কোনটি দ্বিমুখী যোগাযোগের সুবিধা-
ক. একভূতকরণ খ. ভুল বোঝাবুঝি
গ. মিতব্যয়ী ঘ. কোনটিই নয়।

৪। নিম্নের কোনটি দ্বি-মুখী যোগাযোগের অসুবিধা-
ক. সময় সাপেক্ষ খ. মিতব্যয়ী
গ. প্রতিক্রিয়া জানা ঘ. সম্পর্ক স্থাপন

গ্রেপভাইন ও ইহার কারণসমূহ
(Grapvine & Its Causes)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- গ্রেপভাইন সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবেন;
- গ্রেপভাইনের কারণসমূহ জানতে পারবেন; এবং
- সুবিধা-অসুবিধা বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

গ্রেপভাইন-এর সংজ্ঞা ঃ ইংরেজী **"গ্রেপভাইন"** শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো আঙ্গুরের লতা । পশ্চিমা জগতে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগকে **"গ্রেপভাইন"** নামেও অভিহিত করা হয়।

আমেরিকায় ১৮৬০-৬৫ সালে যখন গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন যুদ্ধক্ষেত্রে আঙ্গুরের লতার মতো টেনে টেনে গাছ লাগিয়ে টেলিগ্রাফের তার বসানো হতো। গাছ থেকে গাছে জড়িয়ে জড়িয়ে যেভাবে অসংগঠতভাবে তার টানানো হতো, ঠিক তেমনি অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের "অসংগতি" যোগাযোগের রূপ প্রতিফলিত হয়। এ কারণে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগকে গ্রেপভাইন নামে সম্বোধিত করা হয়। বস্তুতঃ পক্ষে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগেরই আরেক নাম গ্রেপভাইন কমিউনিকেশন।

Griffin বলেন "একটি সংগঠনের মানুষদের মধ্যে যে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ তাকে গ্রেপভাইন বলে"।

গবেষনায় দেখা গেছে যে, গ্রেপভাইন বা অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের চারটি ধরন রয়েছেঃ

১) এক ব্যক্তি থেকে আরেক ব্যক্তির নিকট তথ্য প্রেরণ।

২) গল্পের ভঙ্গি; একজন বলবে অন্যরা শুনবে

৩) সম্ভাবনা স্টাইল; প্রত্যেকে অন্যের নিকট ইচ্ছামত বলবে

৪) গুচ্ছ স্টাইল; কেউ কেউ অন্য কয়েকজন নির্দিষ্ট লোকের নিকট বলবে।

ইহার কারণসমূহ ঃ যেহেতু গ্রেপভাইন একটি অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ, যেহেতু ব্যবস্থাপনার আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে ইহা কাজ করতে পারে। সুতরাং, ইহা সংগঠনের ভালোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। নিম্নোক্ত কারণে ইহার ব্যবহার প্রতিষ্ঠানে দেখা যায়-

১. যখন প্রতিষ্ঠানের কর্মরত কর্মচারিরা চাকুরিতে অনিশ্চয়তা অনুভব করে তখন গ্রেপভাইন সংগঠিত হয়।

২. গ্রেপভাইন সংগঠিত হওয়ার আরেকটি অন্যতম কারণ হলো, যদি একটি সিস্টেম এ বন্ধুরা বা সহকর্মিরা সংশ্লিষ্ট থাকে। যেমন-অফিসে প্রমোশন বা কারো চাকুরিচ্যুতের খবর দ্রুত ইহার মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে।

৩. সম্প্রীতিকালের তথ্য প্রবাহ দ্রুত প্রচারের জন্য ইহার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

৪. ব্যক্তিত্ব অনেক সময় গ্রেপভাইনকে প্রভাবিত করে। কিছুলোক বেশি কথা বলতে পছন্দ করে।

উপরোক্ত কারণগুলোর জন্য সাধারণত গ্রেপভাইন সংঘটিত হয়।

গ্রেপেভাইনের সুবিধাসমূহ (Advantages of Grapevine)

১. আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ ঃ গ্রেপেভাইন কর্মচারিদের আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যমে মনকে হালকা করে নেয়ার জন্য একটি নিরাপদ ব্যবস্থা।

২. দায়িত্ব ঃ এ পদ্ধতি কোন নিয়ম কানুন মানে না বলে সরবরাহকৃত তথ্যের জন্য সংগঠনের কাকেও দায়ী করা যায় না।

৩. সমন্বয় ঃ গ্রেপেভাইনের মাধ্যমে একে অন্যের সুখ-দুঃখ, ভালমন্দ ইত্যাদির ব্যাপারে খোঁজ খবর নিতে পারে বলে তাদের মধ্যে সমন্বয়সাধন সহজ। একে সংগঠন উপকৃত হয়।

৪. মনোবল বৃদ্ধি ঃ এর যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মিদের মনোবল বৃদ্ধি পায়।

৫. সু-সম্পর্ক ঃ প্রতিষ্ঠানিক বা ব্যক্তিগত ব্যাপারে একে অন্যের সাথে শলা পরামর্শ করে বলে তাদের মধ্যে সু-সম্পর্ক করে।

৬. বিকল্প ঃ যে সব তথ্য আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ প্রেরণ করা সম্ভব নয় সে সব তথ্য বিকল্প হিসেবে গ্রেপেভাইনের মাধ্যমে তথ্য খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

৭. দ্রুততা ঃ গ্রেপেভাইনের মাধ্যমে তথ্য খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

৮. প্রত্যুত্তর ঃ এর মাধ্যমে ব্যবস্থাপক তাঁর প্রেরিত তথ্যের সাথে সাথে প্রত্যুত্তর পেয়ে থাকেন যা সিদ্ধান্ত গ্রহণে খুবই সহায়ক।

গ্রেপেভাইনের অসুবিধাসমূহ (Disadvantages of Grapevine)

১. বিকৃতি ঃ এর মাধ্যমে তথ্যের বিকৃতি ঘটাই স্বাভাবিক। ফলে কাংখিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়।

২. ভিত্তিহীন ঃ গ্রেপেভাইনের মাধ্যমে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তথ্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যা প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্ষতিকর।

৩. অসম্পূর্ণ ঃ এর মাধ্যমে প্রেরিত তথ্য অনেক সময় অসম্পূর্ণ থাকে, যার ফলে তথ্যটি প্রাপকের বোধগম্য হয় না। এতে যোগাযোগই ব্যর্থ হয়।

৪. ভুল-ত্রুটি ঃ এরূপ যোগাযোগের মাধ্যমে তথ্য পরিবেশিত হলে তা কখনও কখনও প্রাপকের নিকট ভুল-ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে হয়। ফলে তথ্যটি লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়।

৫. দ্রুততা ঃ গ্রেপেভাইনের মাধ্যমে মিথ্যা ও গুজব এত দ্রুততার সাথে ছড়িয়ে পড়ে যে, ব্যবস্থাপক তা শুনার পর যথাযথ ব্যবস্থাগ্রহণের সময় ও সুযোগই পান না।

পাঠ সংক্ষেপ

- ইংরেজী **"গ্রেপভাইন"** শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো আঙ্গুরের লতা ।
- একটি সংগঠনের মানুষদের মধ্যে যে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ তাকে গ্রেপভাইন বলে।
- গ্রেপভাইন বা অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের চারটি ধরন রয়েছেঃ-
  ১. এক ব্যক্তি থেকে আরেক ব্যক্তির নিকট তথ্য প্রেরণ।
  ২. একজন বলবে অন্যরা শুনবে।
  ৩. প্রত্যেক অন্যের নিকট ইচ্ছামত বলবে।
  ৪. কেউ কেউ অন্য কয়েকজন নির্দিষ্ট লোকের নিকট বলবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন-

১। ইংরেজী গ্রেপভাইন শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো-
ক. আঙ্গুরের লতা খ. আপেলের লতা
গ. লিচুর পাতা গ. কোনটিনয়

২। প্রেপভাইন এর কয়টি ধরন আছে?
ক. ছয়টি খ. চারটি
গ. আটটি ঘ. দশটি

৩। নিম্নের কোনটি গ্রেপভাইনকে অনেক সময় প্রভাবিত করে?
ক. মনোভাব খ. আবেগ
গ. ব্যক্তিত্ব ঘ. প্রেষণা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. আন্তঃব্যক্তিক ও অন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ বলতে কি বুঝেন?
২. সংক্ষেপে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগে অন্তঃব্যক্তিক ভিত্তিসমূহ বর্ণনা করুন।
৩. গণ-যোগাযোগের প্রকৃতি বর্ণনা করুন।
৪. গণ-যোগাযোগের উদ্দেশ্য আলোচনা করুন।
৫. নিম্নগামী যোগাযোগের উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।
৬. উর্ধ্বগামী ও নিম্নগামী যোগাযোগের পার্থক্য লিখুন।
৭. গমান্তরাল যোগাযোগের মাধ্যমগুলো উল্লেখ করুন।
৮. অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক যোগাযোগের পার্থক্যসমূহ লিখুন।
৯. আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের পার্থক্য লিখুন।
১০. আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের সংজ্ঞা প্রদান করুন।
১১. একমুখী যোগাযোগের সংজ্ঞা দিন।

রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১. আন্ড়বক্তিক যোগাযোগের সংজ্ঞা দিন। এর সমস্যাবলী আলোচনা করুন।
২. আন্ড়ব্যক্তিক যোগাযোগের কার্যকারিতা বৃদ্ধির উপায়গুলো বর্ণনা করুন।
৩. গণ-যোগাযোগের সংজ্ঞা দিন এবং এর মাধ্যমসমূহ বর্ণনা করুন।
৪. গণ-যোগাযোগের আওতা ও গুরুত্ব বর্ণনা করুন
৫. নিম্নগামী যোগাযোগের সংজ্ঞা দিন এবং এর সুবিধা অসুবিধা আলোচনা করুন।
৬. উর্ধ্বগামী যোগাযোগের সংজ্ঞা দিন এবং এর সুবিধা অসুবিধা আলোচনা করুন।
৭. গমান্তরাল যোগাযোগের সংজ্ঞা দিন এবং এর সুবিধা অসুবিধা নিরূপন করুন।
৮. অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ বলতে কি বোঝেন? এর গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।
৯. বাহ্যিক যোগাযোগের সংজ্ঞা দিন এবং এর গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।
১০. আভ্যন্তরীণ যোগাযোগের মাধ্যম বা পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করুন।
১১. অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের সংজ্ঞা দিন এবং এর সুবিধা অসুবিধাসমূহ লিখুন।
১২. দ্বি-মুখী যোগাযোগের সংজ্ঞা দিন এবং এর সুবিধা অসুবিধা বর্ণনা করুন।
১৩. গ্রেপভাইন এর সংজ্ঞাদিন। ইহার কারণসমূহ বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.১	ঃ	১. খ	২.গ	৩.খ	৪.ক	৫.ক.	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.২	ঃ	১. ক	২.খ	৩.ক	৪.ঘ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৩	ঃ	১. ক	২.খ	৩.ক	৪.ক.	৫.খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৪	ঃ	১. খ	২.খ	৩.ক	৪.গ	৫.ক.	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৫	ঃ	১. খ	২.ক	৩.গ	৪.ক	৫.ক.	৬.ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৬	ঃ	১. গ	২.খ	৩.ক	৪.খ	৫.ক.	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৭	ঃ	১. গ	২.ক	৩.ক	৪.ক		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৮	ঃ	১. ক	২.খ	৩.গ			